মুখ আর মুখোশ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মুখ আর মুখোশ

প্রথম । মানুষ-চুরি

চঞ্চল হয়ে উঠেছে কলকাতা শহর।

কলকাতার চঞ্চলতা কিছু নতুন কথা নয়। বসন্ত, ডেঙ্গু, ফ্লু, বেরিবেরি, প্লেগ, কলেরা ও টাইফয়েড প্রভৃতির জীবাণু প্রায়ই এখানে বেড়াতে এসে তাকে করে তোলে চঞ্চল। সাম্প্রদায়িক। দাঙ্গা-হাঙ্গামেও সে অচঞ্চল থাকতে পারে না। আজকাল উড়োজাহাজি-বোমার ভয়েও সে চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু আমি ওরকম চঞ্চলতার কথা বলছি না।

মাসখানেক আগে শ্যামলপুরের বিখ্যাত জমিদার কমলকান্ত রায়চৌধুরী কলকাতার এসেছিলেন বড়দিনের উৎসব দেখবার জন্যে। তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম বিমলাকান্ত। বয়স দশ বৎসর। একদিন সকালে সে বাড়ি-সংলগ্ন বাগানে খেলা করছিল। তারপর অদৃশ্য হয়েছে হঠাৎ।

লোহার ব্যবসায়ে বাবু পতিতপাবন নন্দী ক্রোড়পতি হয়েছেন বলে বিখ্যাত। তার টাকা অসংখ্য বটে, কিন্তু সন্তান-সংখ্যা মাত্র দুটি। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স মোটে আট বৎসর। পাড়ারই ইস্কুলে সে পড়ে। কিন্তু একদিন ইস্কুলে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। তারপরদিনও না, তারও পরদিনও না। তারপর বিশ দিন কেটে গিয়েছে, আজ পর্যন্ত তার আর কোনও খবরই পাওয়া যায়নি।

দুর্জয়গড়ের করদ মহারাজা স্যার সুরেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ বাহাদুর বড়দিনে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন যুবরাজ বিজয়প্রতাপ, বয়স চার বৎসর মাত্র। গত পরশু রাত্রে ধাত্রী গঙ্গাবাঈ যুবরাজকে নিয়ে ঘুমোতে যায়। কিন্তু গেল কাল সকালে উঠে দেখে, বিছানায় যুবরাজ নেই। সারা

রাজবাড়ি খুঁজেও যুবরাজকে পাওয়া যায়নি। রাত্রির অন্ধকার যুবরাজকে যেন নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলেছে! গঙ্গাবাঈ কোনওরকম সন্দেহের অতীত। তার বয়স ষাট বৎসর; ওর মধ্যে পঞ্চাশ বৎসর কাটিয়েছে সে দুর্জয়গড়ের প্রাসাদে। বর্তমান মহারাজা পর্যন্ত তার হাতেই মানুষ।

সুতরাং অকারণেই কলকাতা চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। এক মাসের মধ্যে তিনটি শ্রেষ্ঠ পরিবারের বংশধর অদৃশ্য! চারিদিকে বিষম সাড়া পড়ে গিয়েছে। ধনীরা শঙ্কিত, জনসাধারণ চমকিত, পুলিশরা ব্যতিব্যস্ত!

খবরের কাগজরা যো পেয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। এমনকী গুজব শোনা যাচ্ছে যে, দুর্জয়গড়ের যুবরাজের অন্তর্ধানের পর গভর্মেন্টেরও টনক নড়েছে। সরকারের তরফ থেকে পুলিশের ওপরে এসেছে নাকি জোর হুমকি!

কিন্তু পুলিশ নতুন কোনও তথ্যই আবিষ্কার করতে পারেনি। সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের তিন-তিনটি বংশধর একমাসের ভিতরে নিরুদ্দেশ হয়েছে ব্যস, এইখানেই সমস্ত খোঁজাখুঁজির শেষ। তারা কেন অদৃশ্য হয়েছে, কেমন করে অদৃশ্য হয়েছে এবং অদৃশ্য হয়ে আছেই-বা কোথায়, এ-সমস্তই রহস্যের ঘোর মায়াজালে ঢাকা।

কলকাতায় মাঝে মাঝে ছেলেধরার উৎপাত হয় শুনি। কিন্তু ছেলেধরারা ধনী গরিব বাছে বলে শুনিনি। তারা ছেলে ধরত নির্বিচারে এবং গরিবেরই ছেলেচুরি করবার সুযোগ পেত বেশি। এও শোনা কথা যে, সন্ন্যাসীরা নিজেদের চ্যালার সংখ্যা বাড়াবার ও বেদেরা নিজেদের দলবৃদ্ধি করবার জন্যেই ওভাবে ছেলেচুরি করে। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেধরার গুজব যে বাজে হুজুগ বলে প্রমাণিত হয়েছে, এ-সত্যও কারুর জানতে বাকি নেই।

কিন্তু এবারের ঘটনাগুলো নতুনরকম। প্রথমত, চুরি যাচ্ছে কেবল ধনীদেরই সন্তান। দ্বিতীয়ত, তিনটি ছেলেই আপন আপন পিতার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তৃতীয়ত, কেউ যে এদের ধরে নিয়ে গিয়েছে এমন কোনও প্রমাণও নেই।

হেমন্ত নিজের চিরদিনের অভ্যাস মতো ইজিচেয়ারে অর্ধ-শয়ান অবস্থায় দুই চোখ মুদে আমার কথা ও যুক্তি শুনে যাচ্ছিল নীরবে, হঠাৎ ঘরের কোণে ফোন-যন্ত্র বেজে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং!

হেমন্ত যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চেয়ার ত্যাগ করে ঘরের কোণে গিয়ে রিসিভার তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো! কে? ও! হ্যাঁ, আমি অধম হেমন্তই! প্রণত হই অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সাহেব! আপনার পদোন্নতির জন্যে কনগ্রাচুলেশন! তারপর? ব্যাপার কী, হঠাৎ ফোনের সাহায্য নিয়েছেন কেন? নতুন কোনও মামলা হাতে নেবার ইচ্ছা আমার আছে কিনা? দেখুন, মানুষের ইচ্ছা হচ্ছে অনন্ত, কিন্তু সাধ্য সীমাবদ্ধ। মামলাটা কি, আগে শুনি। দুর্জয়গড়ের হারা-যুবরাজের মামলা? না মশাই, স্বাধীনভাবে অতবড় মামলা হাতে নিতে আমার ভয় হচ্ছে। আপনাদের আড়ালে থেকে কাজ করি, সে হচ্ছে আলাদা কথা; কারণ সেটা দাবা-বোড়ের উপর-চাল বলে দেওয়ার মতন সোজা। আপনারা থাকতে আমি কেন? কি বললেন, খোদ মহারাজের ইচ্ছে, মামলাটা আমি গ্রহণ করি? বলেন কী, আমি এত বড় বিখ্যাত লোক হয়ে উঠেছি?...আমার কোনও আপত্তি শুনবেন না? দুর্জয়গড়ের প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে দশ মিনিটের মধ্যে এখানে এসে আমাকে আক্রমণ করবেন? বেশ, আক্রমণ করুন, ক্ষতি নেই; কিন্তু আত্মরক্ষা করবার জন্যে যদি না বলবার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার মুখ বন্ধ থাকবে না, এটা কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখলুম!

.

দ্বিতীয় । দুর্জয়গড়ের মামলা

রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে হেমন্ত আমার কাছে এসে বললে, রবীন, সব শুনলে তো?

হ্যাঁ। পুলিশের সতীশবাবু তাহলে তোমার ঘাড়েই মামলাটা চাপাতে চান?

হেমন্ত জবাব দিলে না। নিজের চেয়ারে বসে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে কি ভাবতে লাগল। তারপর বললে, এ-মামলাটা ঘাড়ে নেওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হবে?

কেন হবে না।

স্বাধীনভাবে কখনও কাজ বা এরকম মামলা নিয়ে কখনও নাড়াচাড়া করিনি।

তাতে কি হয়েছে, শনৈঃ পর্বতলঙঘন!

তুমি ভুল করছ রবীন! আমি ঠিক গোয়েন্দা নই, অপরাধ-বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্র। যদিও এই বিশেষ বিজ্ঞানটিকে আমি গ্রহণ করেছি একশ্রেণির আর্ট হিসাবেই। হয়তো তুমি বলবে বিজ্ঞানের সঙ্গে আর্টের বা কলার সম্পর্ক নেই, কিন্তু ভুলে যেও না যেন, প্রাচীন ভারতে চৌর্যবৃত্তিকেও চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা বলে গ্রহণ করা হত। চুরি করা যদি আর্ট হয়, চোর-ধরাও আর্ট হবে না কেন? সুতরাং এক হিসাবে আমি আর্টেরই সেবক। গোয়েন্দারূপে নাম কেনবার জন্যে আমার মনে একটুও লোভ নেই–যদিও অপরাধ-বিজ্ঞান হচ্ছে আমার একমাত্র hobby বা ব্যসন! পুলিশের সঙ্গে থাকি, কেন না হাতেনাতে পরীক্ষা করবার সুযোগ পাই, এইমাত্র! পেশাদার গোয়েন্দার মতন দুর্জয়গড়ের মহারাজাবাহাদুরের হুকুম তামিল করতে যাব কেন?

হেমন্ত আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাড়ির সামনে রাস্তায় একখানা মোটর এসে দাঁড়ানোর শব্দ শুনে চুপ মেরে গেল!

মিনিট-খানেক পরেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার সতীশবাবুর সঙ্গে একটি সাহেবি পোশাক পরা ভদ্রলোক–তাঁর মুখখানি হাসিখুশিমাখা, সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা। বয়স চল্লিশের ভিতরেই।

সতীশবাবু বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, ইনিই হচ্ছেন হেমন্তবাবু, আর উনি ওঁর বন্ধু রবীনবাবু।..

...হেমন্তবাবু, ইনি হচ্ছেন মিঃ গাঙ্গুলি, দুর্জয়গড়ের মহারাজাবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি।

অভিবাদনের পালা শেষ হল।

মিঃ গাঙ্গুলি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, হেমন্তবাবু, আপনার বয়স এত অল্প! এই বয়সেই আপনি এমন নাম কিনেছেন!

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, আমি যে নাম কিনেছি, আমার পক্ষেই এটা আশ্চর্য সংবাদ!

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, বিলক্ষণ! আপনি নাম না কিনলে মহারাজাবাহাদুর আপনাকে নিযুক্ত করবার জন্যে এত বেশি আগ্রহ প্রকাশ করতেন না।

মিঃ গাঙ্গুলি সরলভাবে হেমন্তের সুখ্যাতি করবার জন্যেই কথাগুলো বললেন, কিন্তু ফল হল উলটো। হেমন্তের মুখ লাল হয়ে উঠল। রূঢ়স্বরে সে বললে, নিযুক্ত? নিযুক্ত মানে কী?

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, যুবরাজের মামলাটা মহারাজাবাহাদুর আপনার হাতেই অর্পণ করতে চান। এজন্যে তিনি প্রচুর পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছেন। মামলার কিনারা হলে যথেষ্ট পুরস্কারও–

ক্রুদ্ধস্বরে বাধা দিয়ে হেমন্ত বলে উঠল, ধন্যবাদ! মিঃ গাঙ্গুলি, মহারাজাবাহাদুরকে গিয়ে জানাবেন, হেমন্ত চৌধুরী জীবনে পারিশ্রমিক বা পুরস্কারের লোভে কোনও কাজ করেনি! সতীশবাবু, এ-মামলার সঙ্গে আমি কোনও সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা করি না।

সতীশবাবু ভালো করেই হেমন্তকে চিনতেন, তিনি বেশ বুঝলেন তার ঘা লেগেছে। কোথায়। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, মিঃ গাঙ্গুলি, হেমন্তবাবু আমাদের মতন পেশাদার নন, উনি এ-লাইনে এসেছেন স্রেফ শখের খাতিরে, টাকার লোভে কিছু করেন না!

মিঃ গাঙ্গুলি অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, মাপ করবেন হেমন্তবাবু, আমি না জেনে আপনার সেন্টিমেন্টে আঘাত দিয়েছি।

মিঃ গাঙ্গুলির বিনীত মুখ ও ভীত কথা শুনে এক মুহূর্তে হেমন্তের রাগ জল হয়ে গেল। সে হো-হো করে হেসে উঠে বললে, মিঃ গাঙ্গুলি, কোনও ভয় নেই, আমার সেন্টিমেন্ট আপনার আঘাত সামলে নিয়েছে।..ওরে মধু, জলদি চা নিয়ে আয় রে, মিঃ গাঙ্গুলিকে বুঝিয়ে দে, তিনি কোনও অসভ্য গোঁয়ার-গোবিন্দের পাল্লায় এসে পড়েননি।

অনতিবিলম্বেই মধু এসে টেবিলের উপরে চায়ের সরঞ্জাম ও খাবারের থালা সাজিয়ে দিয়ে গেল।

চা-পর্ব শেষ হলে পর হেমন্ত বললে, মিঃ গাঙ্গুলি, খবরের কাগজে যুবরাজের অন্তর্ধান হওয়ার যে বিবরণ বেরিয়েছে, তার উপরে আমরা নির্ভর করতে পারি কি?

অনায়াসে। এমনকী কাগজওয়ালারা আমাদের নতুন কিছু বলবার ফাঁক রাখেনি।

ফাঁক নিশ্চয়ই আছে। কারণ কাগজওয়ালাদের কথা মানলে বিশ্বাস করতে হয় যে, যুবরাজের রক্ত-মাংসের দেহ সকলের অগোচরে হঠাৎ হাওয়া হয়ে শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছে।

সতীশবাবু হেসে বললেন, না, অতটা বিশ্বাস করবার দরকার নেই। কারণ ঘটনাস্থলে আমি নিজে গিয়েছি। মহারাজাবাহাদুর গড়িয়াহাটা রোডের একখানা খুব মস্ত বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। যুবরাজের ঘরবাড়ির শেষপ্রান্তে, দোতলায়। বাড়ির চারিদিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল। একে এই ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার, তায় কুয়াশা ভরা শীতের রাত। তার উপরে বাগানটাও পুরোনো গাছপালায় ঝুপসি। বাইরের কোনও লোক অনায়াসেই পাঁচিল টপকে সকলের অগোচরে যুবরাজের ঘরের তলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, কিন্তু দোতলায় যুবরাজের ঘরের ভিতরে সে ঢুকবে কেমন করে?

অত্যন্ত সহজে।

সহজে? আপনি কি ভুলে যাচ্ছেন, গঙ্গাবাঈ বলেছে, ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল লাগিয়ে। দিয়েছিল? আর সকালে উঠে খিল খুলেছিল নিজের হাতেই?

গঙ্গাবাঈয়ের সাবধানতা হয়েছিল একচক্ষু হরিণের মতো। যুবরাজের ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুমের দরজাটা ছিল ভোলা। বাগান থেকে মেথর আসবার জন্যে বাথরুমের পিছনে যে কাঠের সিঁড়িটা ছিল, বাইরের যে-কোনও লোক সেই সিঁড়ি বয়ে উঠে প্রথমে বাথরুমে, তারপর যুবরাজের ঘরে ঢুকতে পারে।

হেমন্ত বললে, যাক, যুবরাজের অন্তর্ধানের রহস্যটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন এতদিন পরে আমার আর ঘটনাস্থলে যাওয়ার দরকার নেই। এখন কথা হচ্ছে, এ-চুরি করলে কে?

সতীশবাবু বললেন, অন্য সময় হলে আমি রাজবাড়ির লোককেই সন্দেহ করতুম, কিন্তু আপাতত সেটা করতে পারছি না।

হেমন্ত বললে, কেন?

এই মাসেই এর আগে কলকাতায় একই রকম আরও দুটো ঘটনা হয়ে গেছে। ও দুটো ঘটনা যখন ঘটে, দুর্জয়গড়ের মহারাজাবাহাদুর তখন কলকাতায় পদার্পণ করেননি। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে, শহরে এমন একদল দুষ্টের আবির্ভাব হয়েছে, ছেলে চুরি করাই হচ্ছে যাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার মতে, এই তিনটে ঘটনা একই দলের কীর্তি।

আমিও আপনার মতে সায় দি। কিন্তু চোর-চরিত্রের একটা রহস্য আমরা সকলেই জানি। প্রত্যেক শ্রেণির চোর নিজের বিভাগ ছাড়া অন্য বিভাগে হাত দিতে চায় না। যারা সাইকেল চুরি করে, বার বার ধরা পড়েও তারা চিরদিনই সাইকেল-চোরই থেকে যায়। আর একদলের বাঁধা অভ্যাস, রাতে গৃহস্থের ঘরে ঢুকে যা-কিছু পাওয়া যায় চুরি করে পালানো। এমনি নানা বিভাগের নানা বিশেষজ্ঞ চোর আছে, কদাচ তারা আপন আপন অভ্যাস ত্যাগ করে। কিন্তু এরকম ছেলেচোরের দল এদেশে নতুন নয় কি?

মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, শুনেছি, আমেরিকায় এরকম ছেলেচোরের উৎপাত অত্যন্ত বেশি!

সতীশবাবু বললেন, হ্যাঁ, কাগজে আমিও পড়েছি বটে।

হেমন্ত বললে, সতীশবাবু, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যে, আমেরিকার ধনকুবেররা এইসব ছেলেচোরের ভয়ে কতটা তটস্থ হয়ে থাকে। তাদের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে মাইনে করা প্রাইভেট ডিটেকটিভরা। তবু প্রায় নিত্যই শোনা যায়, এক-এক ধনকুবেরের ছেলে চুরি যাচ্ছে আর চোরেদের কাছ থেকে চিঠি আসছে হয় এত টাকা দাও, নয় তোমার ছেলেকে মেরে ফেলব!

সতীশবাবু বললেন, কিন্তু আমাদের এই চোরের দলের উদ্দেশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তিন-তিনটি ধনীর বংশধর চুরি গেল, কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রয়ের টাকা আদায় করবার জন্যে চিঠি আসেনি!

হেমন্ত বললে, এখনও আসেনি বটে, কিন্তু শীঘ্রই আসবে বোধহয়।

একথা কেন বলছেন?

আমার যা বিশ্বাস, শুনুন বলি। এই ছেলে চুরিগুলো যে একজনের কাজ নয়, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কারণ লক্ষ করলেই আন্দাজ করা যায়, প্রত্যেক ক্ষেত্রে গৃহস্থদের অভ্যাস প্রভৃতির দিকে ভালো করে নজর রেখেই কাজ করা হয়েছে। এজন্যে দীর্ঘ কাল আর একাধিক লোকের দরকার। কিন্তু মূলে আছে যে একজনেরই মস্তিষ্ক তাতেও আর সন্দেহ নেই। সে নিশ্চয়ই এদেশে নতুন কিংবা অপরাধের ক্ষেত্রে নেমেছে এই প্রথম। কারণ এ-শ্রেণির অপরাধ কলকাতার। আগে ছিল না। সেই লোকটিই একদল লোক সংগ্রহ করে বেছে বেছে ছেলেচুরি আরম্ভ করেছে। তার বাছাইয়ের মধ্যেও তীক্ষ্ণদৃষ্টির পরিচয় আছে। গরিবের ছেলে নয়, সাধারণ ধনীর ছেলেও নয়–যারা অদৃশ্য হয়েছে তারা প্রত্যেকেই পিতার একমাত্র পুত্র। এই নির্বাচন-ব্যাপারেও একমাত্র মস্তিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায়। হ্যাঁ, সতীশবাবুর একটা কথা মানতেই হবে। এ-চোর দুর্জয়গড়ের রাজবাড়ি সম্পর্কীয় লোক

না হতেও পারে। কারণ মহারাজা সদলবলে কলকাতার আসবার অনেক আগেই ঠিক একই-রকম ট্রেডমার্ক মারা আরও দুটো ছেলেচুরি হয়ে গেছে। সতীশবাবু বলছেন, চোরের উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার মতে, চেষ্টা করলেই সেটা বোঝা যায়। এই ছেলেচোরদের দলপতি বড়ই চতুর ব্যক্তি। অপরাধ-ক্ষেত্রে সে নতুন পথ অবলম্বন করেছে বলেই সন্দেহ হচ্ছে, হয়তো সে রীতিমতো শিক্ষিত ব্যক্তি। এখনও সে যে নিজের উদ্দেশ্য জাহির করেনি, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, পুলিশকে সে গোলকধাঁধায় ফেলে রাখতে চায়। চোর যে নিষ্ক্রয়ের টাকা আদায়ের লোভেই চুরি করছে এ-সত্য গোড়াতেই প্রকাশ করতে সে রাজি নয়। কারণ এই সুক্ষ্মবুদ্ধি শিক্ষিত চোর জানে, প্রথমেই পুলিশ আর জনসাধারণ ছেলেচুরির উদ্দেশ্য ধরে ফেললে, কেবল তার স্বার্থসিদ্ধির পথই সংকীর্ণ হয়ে আসবে না, তার ধরা পড়বার সম্ভাবনাও থাকবে যথেষ্ট। তাই সে পুলিশ আর জনসাধারণের অন্ধতা দূর করতে চায়নি। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন, আজ হোক কাল হোক চোরের উদ্দেশ্য আর বেশিদিন গোপন হয়ে থাকবে না। সতীশবাবু, আজ এই পর্যন্ত। আমাকে আরও কিছু ভাববার সময় দিন। কাল সকালে একবার বেড়াতে বেড়াতে এদিকে আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।

.

তৃতীয়। কোড

পরের দিন সকালবেলা। চা পানের পর হেমন্ত অন্যান্য দিনের মতন আমার সঙ্গে গল্প করলে না, ইজিচেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে দুই চোখ মুদে ফেললে। বুঝলুম, নতুন মামলাটা নিয়ে সে এখন মনে-মনে জল্পনা কল্পনায় নিযুক্ত।

টেবিলের উপর থেকে বিশ্বদর্পণ পত্রিকাখানা তুলে নিলুম। সমস্ত কাগজখানার উপরে চোখ বুলিয়ে গেলুম, কিন্তু পড়বার মতন খবরের একান্ত অভাব। এমনকী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ বেধেছে ইউরোপে, তারও খবরগুলো কী একঘেয়ে! প্রতিদিনই যুদ্ধের

খবর পড়ি আর মনে হয়, যেন কতকগুলো বাঁধা বুলিকেই বারংবার উলটেপালটে ব্যবহার করে টাটকা খবর বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলা কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের রচনা পাঠ করা সময়ের অপব্যবহার মাত্র। তার ভাষা ভাব যুক্তি সমস্তই জাহির করে দেয় যে, সম্পাদক প্রাণপণে কলম চালিয়ে গেছেন কেবলমাত্র পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে। রোজ তাঁকে লিখতে হবেই, কারণ সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলো হচ্ছে সংবাদপত্রের শোভার্থে এবং পাদপূরণের জন্যে।

তারপর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করলুম। আমার মতে বাংলা সংবাদপত্রের সব চেয়ে সুখপাঠ্য বিষয় থাকে তার বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠাগুলোয়। তার প্রধান কারণ বোধহয় বাংলার কাগুঁজে-লেখক বা সহকারী সম্পাদকদের মসীকলঙ্কিত কলমগুলো এ-বিভাগে অবাধ বিচরণ করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ছত্রে ছত্রে কী বৈচিত্র্য! মানুষের মনোবৃত্তির কতরকম পরিচয়! কেউ বলছেন, চার আনায় এক সোনা বিক্রি করবেন। কেউবা এমন উদার যে, ট্র্যাকের কড়ি ফেলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করবেন যে-কোনও দুরারোগ্য রোগের মহৌষধ! কেউ প্রচার করছেন, তিনি বুড়োকে ছোঁড়া করবার উপায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন! কোথাও বৃদ্ধ পিতা পলাতক পুত্রকে অন্বেষণ করছেন। কোথাও প্রাচীন বর তৃতীয় পক্ষের বউ পাওয়ার জন্যে বলছেন, তিনি বরপণ চান না!...এসব পড়তে পড়তে চোখের সামনে কত রঙের কত মজার ছবি জেগে ওঠে! মনে হয়, দুনিয়া কী অপূর্ব!

হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। সেটি এই রাজকুমার, তুমি মোহনবাবুকে দ্বীপবাড়িতে লইয়া উপস্থিত হইয়ো। তাহার সঙ্গে পরে উৎসবের কর্তব্য, বাবুরা পত্রে সমস্ত জানাইবেন।

ভাষাটা লাগল কেমন কটমট, আড়ষ্ট। দেশে ডাকঘর ও সুলভ ডাকটিকিট থাকতে কেউ এমন বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ আর সময় নষ্ট করতে চায় কেন। সাধারণ পত্র তো এই খবরের কাগজের আগেই যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছোতে পারত।

বিজ্ঞাপনদাতাদের নির্বুদ্ধিতা দেখে নিজের মনেই বললুম, আশ্চর্য!

হেমন্ত চোখ খুলে বললে, কী আশ্চর্য, রবীন? আবার নতুন ছেলে চুরি গেল না কি?

না, কে একটা লোক কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের নির্বুদ্ধিতা জাহির করেছে।

দেখি বলে হেমন্ত হাত বাড়ালে, কাগজখানা আমি তার দিকে এগিয়ে দিলুম।

হেমন্ত বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট কাল স্থির ও নীরব হয়ে বসে রইল।

আমি বললুম, কি হে, তোমার ভাব দেখলে মনে হয়, তুমি যেন কোনও মহাকাব্যের রস আস্বাদন করছ!

হেমন্ত সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, তাই করছি রবীন, তাই করছি! তবে কাব্য নয়, নাটক!

নাটক?

হ্যাঁ, একটি অপূর্ব নাটকের অভিনেতাদের কথা ভাবছি।

ওই বিজ্ঞাপন দেখে?

এটি সাধারণ বিজ্ঞাপন নয়।

তবে?

এটি হচ্ছে কোড-এ অর্থাৎ সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা একখানি পত্র।

কী বলছ তুমি?

পৃথিবীতে কতরকম পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক লিপি রচনা করা যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে খানকয় বই আমার লাইব্রেরিতে আছে। এই সাঙ্কেতিক লিপিতে খুব সহজ একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এই সাঙ্কেতিক লিপিতে প্রত্যেক শব্দের পরের শব্দকে ত্যাগ করলেই আসল অর্থ প্রকাশ পাবে। এর বিরাম-চিহ্নগুলো–অর্থাৎ কমা, দাঁড়ি, প্রভৃতি ধর্তব্য নয়, ওগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল বাইরের চোখকে ঠকাবার জন্যে। এখন পড়ে দেখো, বুঝতে পারো কি না!

কাগজখানা নিয়ে পড়লুমঃ

রাজকুমার মোহনদ্বীপবাড়িতে উপস্থিত। তাহার পরে কর্তব্য পত্রে জানাইবেন!

বললম, হেমন্ত, কথাগুলোর মানে বোঝা যাচ্ছে বটে। কিন্তু এই কথাগুলো বলবার জন্যে সাঙ্কেতিক শব্দের প্রয়োজন হল কেন?

হেমন্ত ভাবতে-ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, এখনি ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারছি না। তবে খানিকটা আন্দাজ করলে ক্ষতি নেই। রাজকুমার অর্থে না হয় ধরলুম রাজার কুমার। কিন্তু মোহনদ্বীপবাড়ি বলতে কি বোঝাতে পারে? ওটা কি কোনও স্থান বা গ্রামের নাম? তা–

ধাঁ করে আমার মাথায় একটা সন্দেহ খেলে গেল, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে আমি বলে উঠলুম, হেমন্ত! তুমি কি বলতে চাও, দুর্জয়গড়ের যুবরাজের অন্তর্ধানের সঙ্গে এই সাঙ্কেতিক পত্রের কোনও সম্পর্ক আছে?

এখনও অতটা নিশ্চিত হতে পারিনি। তবে যুবরাজ অদৃশ্য হয়েছেন আজ তিন দিন আগে। এর মধ্যেই সাঙ্কেতিক লিপিতে রাজকুমার শব্দটি দেখে মনে খানিকটা খটকা লাগছে বইকী। চিঠিখানা পড়লে মনে হয়, কেউ যেন কারুকে গোপনে জানাতে চাইছে–

রাজপুত্রকে আমরা মোহনদ্বীপবাড়িতে এনে হাজির করেছি। এর পর আমরা কী করব আপনি পত্রের দ্বারা জানাবেন। রবীন, আমার এ অনুমান অসঙ্গত কিনা, তা জানবার কোনওই উপায়। নেই।

আমি বললুম, কিন্তু ডাকঘর থাকতে এভাবে চিঠি লেখা কেন?

ওরা বোধহয় ডাকঘরকে নিরাপদ মনে করে না। হয়তো ভাবে, ডাকঘরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তার সঙ্গে পত্রপ্রেরক নিজে মুখোমুখি দেখা করেও তো সব বলতে পারে?

তাও হয়তো নিরাপদ নয়। ধরো, দলপতিকেই সব জানানো দরকার। কিন্তু দলপতি থাকতে চায় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের চোখের আড়ালে। যে-শ্রেণির সন্দেহজনক লোক তার পরামর্শে যুবরাজকে চুরি করেছে, ও-শ্রেণির সঙ্গে প্রকাশ্যে সম্পর্ক রেখে সে পুলিশের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না।...রবীন, আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে বলতে হবে যে, বাংলা দেশের এই আধুনিক ছেলেধরা বিলাতি ক্রিমিনালদের অনুসরণ করতে চায়। বিলাতি অপরাধীরাও এইভাবে সাঙ্কেতিক লিপি লিখে খবরের কাগজের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে কথা চালাচালি করে।..কিন্তু, কিন্তু, মোহনদ্বীপবাড়ি কোথায়?

ও-নাম এর আগে আমি কখনও শুনিনি।

হু; দ্বীপ..দ্বীপ-এ শব্দটার সঙ্গে যেন জলের সম্পর্ক আছে। দ্বীপবাড়ি মানে কী? দ্বীপের মধ্যে কোনও বাড়ি? তাহলে কথাটা কি এই দাঁড়াবে-অগ্রদ্বীপ বা কাকদ্বীপের মতন মোহন নামে দ্বীপের মধ্যেকার কোনও বাড়িতে আছেন এক রাজকুমার? কি বল হে?

হয়তো তাই।

ধেৎ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করাও বিড়ম্বনা, তুমি নিজে কিছু মাথা ঘামাবে না, খালি করবে আমার প্রতিধ্বনি!

তার বেশি সামর্থ্য আমার তো নেই ভাই!

হেমন্ত চিন্তিতমুখে কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সমুজ্জ্বল মুখে বলে উঠল, ঠিক, ঠিক! পত্রপ্রেরক কারুর কাছে জানতে চেয়েছে, অতঃপর তার কি করা কর্তব্য–কেমন?

হ্যাঁ।

তাহলে ওই খবরের কাগজের স্তম্ভেই এর উত্তরটাও তো প্রকাশিত হতে পারে?

সম্ভব।

রবীন, তুমি জানো, আমাদের বিশেষ বন্ধু চিন্তাহরণ চক্রবর্তী হচ্ছে বিশ্বদর্পণের সম্পাদক?

তা আবার জানি না, প্রত্যেক বছরেই বিশ্বদর্পণের বিশেষ বিশেষ সংখ্যার জন্যে আমাকে কবিতা আর গল্প লিখতে হয়!

তবে চিন্তাহরণই এবারে তার নামের সার্থকতা প্রমাণিত করবে।

মানে?

আমাদের চিন্তা হরণ করবে। অর্থাৎ এই সাঙ্কেতিক লিপির উত্তর বিশ্বদর্পণে এলেই সেখানা আমাদের হস্তগত হবে।

কিন্তু তাহলে কি চিন্তাহরণের সম্পাদকীয় কর্তব্যপালনে ত্রুটি হবে না?

আরে, রেখে দাও তোমার ওসব ঘেঁদো কথা! এমন বিপদজনক অপরাধী গ্রেপ্তারে সাহায্য করলে তার পুণ্য হবে হে, পুণ্য হবে! চললুম আমি চিন্তাহরণের কাছে!

.

চতুর্থ । মোহন নামক দ্বীপ

রবীন যখন বিশ্বদর্পণ কার্যালয় থেকে ফিরে এল, তখন বিপুল পুলকে নৃত্য করছে তার দুই হাসিমাখা চক্ষু!

বললুম, কী হে, ভারী খুশি যে!

রবীন ধপাস করে তার ইজিচেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, চেয়েছিলুম মেঘ, পেয়ে গেলুম জল!

অর্থাৎ!

শোনো। ভেবেছিলুম, চিন্তাহরণকে আজ খালি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলে আসব যে, এধরনের কোনও সাঙ্কেতিক পত্র এলেই সে যেন তার কথাগুলো লিখে নিয়ে মূল চিঠিখানা আমাকে দেয়। কারণ এত তাড়াতাড়ি উত্তর আসবার কল্পনা আমি করিনি। কিন্তু আমি যাওয়ার মিনিট পাঁচেক আগেই একজন দ্বারবান এসে সাঙ্কেতিক লিপির উত্তর আর বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়ে গেছে! যদি আর-একটু আগে যেতে পারতুম!

তাহলে কী হত?

আমিও যেতে পারতুম দ্বারবানের পিছনে পিছনে। তার ঠিকানা পেলে তো আর ভাবনাই ছিল না, তবে যেটুকু পেয়েছি তাই-ই যথেষ্ট।

উত্তরটা দেখবার জন্যে আমি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলুম। হেমন্ত আমার হাতে দিলে একখানা খুব পুরু, খুব বড় আর খুব দামি খাম। তার ভিতরে ছিল এই চিঠি।

রাজকুমার, নব-দ্বীপেই জবানবন্দি দেওয়া হউক। জানিও, তোমার এই কলিকাতায় ছাপাখানার কাজ বন্ধ নাই।

পড়লে?

হুঁ। কিন্তু নবদ্বীপেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে।

কিচ্ছু গুলোবে না। নবদ্বীপ আর জবানবন্দির মাঝে হাইফেন আছে দেখছ না, তার মানে নব আর জবান আলাদা আলাদা শব্দ বলে ধরা হয়েছে। এইবার একটা অন্তর বাজে শব্দ ফেলে দিয়ে পড়ো দেখি!

এবারে পড়লুম:

রাজকুমার দ্বীপেই বন্দি হউক। তোমার কলিকাতায় কাজ নাই।

রবীন, দুটো বিজ্ঞাপনেরই পাঠ উদ্ধার করলে তো? এখন তোমার মত কি?

আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলুম, বন্ধু, তোমাকে বন্ধু বলে ডাকতে পারাও সৌভাগ্য! কী তোমার সূক্ষ্মদৃষ্টি! এই বিজ্ঞাপনের প্রথমটা হাজার হাজার লোকের চোখে পড়েছে, তাদের মধ্যে কত পুলিশের লোকও আছে–যারা চোর ধরবার জন্যে মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে সাত পৃথিবী! কিন্তু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছ একমাত্র তুমি!

আমাকে একেবারে সপ্তম স্বর্গে তুলে দিও না রবীন, পৃথিবীর জ্যান্ত মানুষকে স্বর্গে পাঠানো শুভাকাঙ্ক্ষীর কাজ নয়। আগেই বলেছি, এ কোডটা হচ্ছে অত্যন্ত সহজ। যে কোনও লোক লক্ষ করলেই আসল অর্থ আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু তা না পারবার একমাত্র কারণ হবে, অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞাপনটা হয়তো পড়বেই না, যারা পড়বে তারাও এর গুঢ় অর্থ বোঝবার চেষ্টা করবে না।... এখন কাজের কথা থোক। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আমার অনুমানই সত্য। বিজ্ঞাপনের রাজকুমারই হচ্ছেন, দুর্জয়গড়ের যুবরাজ?

তাতে আর সন্দেহই নেই।

আর যুবরাজকে কোনও দ্বীপে বন্দি করে রাখা হয়েছে সম্ভবত তার নাম মোহন দ্বীপ।

তারপর?

তারপর আরও কিছু জানতে চাও তো, ওই চিঠির কাগজ আর খামখানা পরীক্ষা করো।

খাম আর কাগজখানা বারবার উলটেপালটে দেখে আমি বললুম, বৃথা চেষ্টা করে হাস্যাস্পদ হতে ইচ্ছা করি না। যা বলবার, তুমিই বলো।

উত্তম। প্রথমে দ্যাখো, খাম আর কাগজ কত পুরু আর দামি। গৃহস্থ তো দূরের কথা, বাংলা দেশের বড় বড় ধনী পর্যন্ত ওরকম দামি খাম-কাগজ ব্যবহার করে না। যে ওই চিঠি লিখেছে সে ধনী কিনা জানি না, কিন্তু সে-যে অসাধারণ শৌখিন মানুষ তাতে আর সন্দেহ নেই। এটাও বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ অপরাধীর মতন সে নিম্ন-স্তরের লোকও নয়। কেমন?

মানলুম।

চোখ আর আলোর মাঝখানে রেখে কাগজখানা পরীক্ষা কর।

ভিতরে সাদা অক্ষর ফুটে উঠল। বললুম, লেখা রয়েছে Made in California!

হুঁ। আমি যতদূর জানি, কালিফোর্নিয়ায় তৈরি ওরকম খাম আর চিঠির কাগজ কলকাতায় পাওয়া যায় না। এ-বিষয়ে ভালো করে খোঁজ নিয়ে সন্দেহ দূর করব। আপাতত ধরে নেওয়া যাক, এই খাম আর কাগজ কলকাতার নয়।

তাতে কি বোঝায়?

তাতে এই বোঝায় যে, ছেলেচোরদের দলপতি আমেরিকা-প্রত্যাগত।

তুমি কোন প্রমাণে এই পত্রলেখককে দলপতি ধরে নিচ্ছ?

এই লোকটা দলপতি না হলে, প্রথম পত্রের লেখক, এর কাছে তার কর্তব্য কি জানতে চাইত না।

ঠিক!

এখন কি দাঁড়াল দেখা যাক। আমেরিকা থেকে কলকাতায় এমন একজন লোক ফিরে এসেছে, সে ধনী আর খুব শৌখিন। আমেরিকায় kidnapping বা ধনীর ছেলেচুরি করা হচ্ছে একটা অত্যন্ত চলতি অপরাধ। বছরে বছরে সেখানে এমনি কত ছেলেই যে চুরি যায় তার আর সংখ্যা নেই। সেই দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় নিয়ে আমেরিকা ফেরত এই লোকটি কলকাতায় এসে এক নতুন রকম অপরাধের সৃষ্টি করেছে। সে সাহেব বা ভারতের অন্য জাতের লোক নয়, কারণ বাংলায় চিঠি লিখতে পারে। নিশ্চয়ই সে ভদ্রলোক আর শিক্ষিত। সে নিজের একটি দল গঠন করেছে। খুব সম্ভব এই দলের অধিকাংশ লোকই পাকা আর দাগি অপরাধী বা নিম্নশ্রেণির সন্দেহজনক লোক, কারণ দলপতি প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নয়, পুলিশের নজরে পড়বার ভয়ে।

আমি চমৎকৃত কণ্ঠে বললুম, একটি তিন-চার লাইনের বিজ্ঞাপন তোমাকে এত কথা জানিয়ে দিলে!

হেমন্ত মাথা নেড়ে বললে, কিন্তু এ-সমস্তই মেঘের প্রাসাদ ভাই, মেঘের প্রাসাদ! বাস্তবের এক ঝড়ে এরা যে-কোনও মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। এসব এখনও প্রমাণরূপে ব্যবহার করা অসম্ভব, কারণ পরিণামে হয়তো দেখা যাবে, এর অনেক কিছুই আসল ব্যাপারের সঙ্গে মিলছে না!

আমি বললুম, তবু আশাকরি তুমি অনেকটা অগ্রসর হয়েছ।

হয়তো এগিয়ে গিয়েছি, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে। কে এই আমেরিকা ফেরত লোক? মোহনদ্বীপ কোথায়?...ঠিক, ঠিক! দেখতো গেজেটিয়ার-খানা খুঁজে!

তখনি বই এনে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু ভারতের কোথাও মোহন-দ্বীপের নাম পাওয়া গেল না।

হেমন্ত বললে, হয়তো ওটা স্থানীয় নাম। কিংবা ছেলেচোরের দল কোনও বিশেষ স্থানকে নিজেদের মধ্যে ওই নামে ডাকে।

বৈঠকখানার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

হেমন্ত বললে, সাবধান রবীন! তুমি বড় পেট-আলগা! বোধহয় সতীশবাবু আসছেন, তার কাছে এখন কোনও কথা নয় কারণ এখনও আমি নিজেই নিশ্চিত হইনি!

.

পঞ্চম । ঘন ঘন সাদা মোটর

হ্যাঁ, সতীশবাবুই বটে। ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন, কী হেমন্তবাবু, ভেবে-চিন্তে হদিস পেলেন কিছু?

হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, হদিস? হুঁ-উ, পেয়েছি বইকী!

কী?

হদিশ পেয়েছি কল্পনার-যেটা কবিবর রবীনেরই একচেটে।

বুঝলুম না।

রবীনের মতন আমি কবিতা লিখছি না বটে, তবে কল্পনা-ঠাকুরানির আঁচল ধরে বাছা বাছা স্বপনের ছবি দেখছি। তাতে আমার সময় কাটছে, কিন্তু পুলিশের কোনও কাজে তারা লাগবে না।

আসন গ্রহণ করে সতীশবাবু বললেন, কিন্তু আমরা বহু কষ্টে দু-একটি তথ্য আবিষ্কার করেছি; দেখুন, আপনার কাজে লাগে কি না!

ধন্যবাদ। আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলুম।

যে-রাত্রে দুর্জয়গড়ের যুবরাজ অন্তর্হিত হন, ঘাঁটির পাহারাওয়ালা দেখেছিল, রাত তিনটের সময় একখানা সাদারঙের বড় আর ঢাকা-মোটরগাড়ি গড়িয়াহাটা রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে যাচ্ছে।

এটা খুব বড় তথ্য নয়।

না। তারপর রাত প্রায় শ-তিনটের সময়ে ঠিক ওইরকম একখানা বড়, সাদা-রঙের আর ঢাকা-গাড়ি দেখেছিল টালিগঞ্জের কাছে আর-এক পাহারাওয়ালা।

তারপর?

রাত সাড়ে তিনটের কাছাকাছি ডায়মন্ডহারবার রোডে অবিকল ওইরকম একখানা গাড়ি যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে।

সাদা-রঙের গাড়ি?

হ্যাঁ। তারপর রাত চারটের পর বাঁসড়ার কাছেও এক চৌকিদার ওইরকম একখানা গাড়ি যেতে দেখেছে।

তারপর, তারপর? হেমন্তের কণ্ঠ উত্তেজিত।

ভোরবেলায় দেখা যায়, ক্যানিং-এর দিক থেকে ওইরকম একখানা সাদা গাড়ি ফিরে আসছে। গাড়ির ভিতরে ছিল কেবল ড্রাইভার। সেখানা ট্যাক্সি।

হেমন্ত দাঁড়িয়ে উঠে সাগ্রহে বললে, সেই ট্যাক্সির কোনও খোঁজ পেয়েছেন?

না। তার নম্বর জানা যায়নি। তবে অনুসন্ধান চলছে।

এই তথ্যটাকে আপনি সন্দেহজনক মনে করছেন কেন?

রাত তিনটের পর থেকে সকাল পর্যন্ত, এই সময়টুকুর ভিতরে ঘটনাস্থলের কাছ থেকে ক্যানিং পর্যন্ত চার- চারবার দেখা গেছে একইরকম সাদা-রঙের বড় গাড়ি। ওসব জায়গায় অত রাতে একে তো গাড়ি প্রায়ই চলে না, তার উপরে সাদা ট্যাক্সিও খুব সাধারণ নয়। সুতরাং সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক নয় কি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়! সতীশবাবু, ওই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে দেখবার জন্যে আমারও দুই চক্ষু তৃষিত হয়েছে!.., ক্যানিং, ক্যানিং! গাড়িখানা সকালবেলায় ক্যানিংয়ের দিক থেকে ফিরছিল?

হ্যাঁ।

তারপরেই আরম্ভ সুন্দরবনের জলপথ, না সতীশবাবু?

হ্যাঁ। সে জলপথ সুন্দরবনের বুকের ভিতর দিয়ে একেবারে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আচ্ছা, আসুন তাহলে আবার কল্পনার মালা গাঁথা যাক–এবারে দুজনে মিলে।

তার মানে?

প্রথমে না হয় ধরেই নেওয়া যাক, অপরাধীরা দুর্জয়গড়ের যুবরাজকে নিয়ে ওই ট্যাক্সিতে চড়েই পালাচ্ছিল। ধরুন, তারা ক্যানিংয়েই গিয়ে নেমেছে। আপনি কি মনে করেন, তারা এখনও সেখানেই আছে?

না। ক্যানিং, কলকাতা নয়। তার সমস্তটা তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হয়েছে। কিন্তু কোথাও অপরাধীদের পাত্তা পাওয়া যায়নি।

ধরুন, স্থলপথ ছেড়ে অপরাধীরা অবলম্বন করেছে জলপথ। কিন্তু জলপথে তারা কোথায় যেতে পারে?

সতীশবাবু সচকিত স্বরে বললেন, তাইতো হেমন্তবাবু, আপনার ওই ইঙ্গিতটা যে অত্যন্ত মূল্যবান! এটা তো আমরা ভেবে দেখিনি!

তারা কোথায় যেতে পারে? সমুদ্রে?

সমুদ্রে গিয়ে তাদের লাভ? নৌকায় চড়ে অকূলে ভাসবার জন্যে তারা যুবরাজকে চুরি করেনি!

তবে?

হয়তো তারা কোনও দ্বীপে-টিপে গিয়ে উঠেছে, কিংবা জলপথে খানিকটা এগিয়ে পাশের কোন গাঁয়ে-টায়ে নেমে পড়েছে।

আমার, দৃঢ়বিশ্বাস, তারা উঠেছে কোনও দ্বীপের উপরেই।

আপনার দৃঢ়বিশ্বাসের কারণ কি?

আমি প্রমাণ পেয়েছি। অকাট্য প্রমাণ!

বলেন কি মশাই! এতক্ষণ তো আমায় কিছুই বলেননি?

বলি নি, তার কারণ এতক্ষণ আমার প্রমাণকে অকাট্য বলে মনে করতে পারিনি।

হেমন্ত তখন একে একে বিশ্বদর্পণের সেই বিজ্ঞাপন কাহিনির সমস্তটা বর্ণনা করলে। অপরাধীদের দলপতি সম্বন্ধে তার ধারণাও গোপন রাখলে না।

প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সতীশবাবু বলে উঠলেন, বাহাদুর হেমন্তবাবু, বাহাদুর! দলে দলে পুলিশ দেশে দেশে ছুটোছুটি করে মরছে, আর আপনি এই ছোট্ট বৈঠকখানার

চারদেওয়ালের মাঝখানে ইজি-চেয়ারে বসে এর মধ্যেই এতখানি অগ্রসর হতে পেরেছেন!

না মশাই, আমাকে একবার ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে বিশ্বদর্পণের আপিসে ছুটতে হয়েছিল।

ওকে আবার ছোটা বলে নাকি? ও তো হাওয়া খেতে যাওয়া!

আমি বললুম, কিন্তু মোহনদ্বীপ কোথায়?

সতীশবাবু বললেন, ও-দ্বীপের নাম আমিও এই প্রথম শুনলুম।

হেমন্ত বললে, সমুদ্রের কাছে সুন্দরবনের নদীর মোহনায় আমি ছোট-বড় অনেক দ্বীপ দেখেছি। ছেলেচোরের দল হয়তো ওদেরই মধ্যে একটা কোনও অনামা দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে আর নিজেদের মধ্যে তাকে ডাকতে শুরু করেছে এই নতুন নামে।

খুব সম্ভব তাই। কিন্তু ওখানকার সমস্ত দ্বীপের ভিতর থেকে এই বিশেষ দ্বীপটিকে খুঁজে বার করা তো বড় চারটিখানি কথা নয়!

না। তার ওপরে ওভাবে খোঁজাখুঁজি করলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

কী বিপদ?

অপরাধীরা একবার যদি সন্দেহ করে যে, পুলিশের সন্দেহ গিয়েছে ওই দিকেই, তাহলে যুবরাজকে হত্যা করে তাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ লুপ্ত করে দ্বীপ থেকে সরে পড়তে পারে!

তবেই তো!

তার চেয়ে আর-এক উপায়ে খোঁজ নেওয়া যাক। মনে হচ্ছে, ছেলেচোররা প্রায়ই ক্যানিং থেকে নৌকো ভাড়া নিয়ে ওই দ্বীপে যায়। আমার বিশ্বাস, ক্যানিংয়ের মাঝিদের কাছে গোপনে সন্ধান নিলে মোহনদ্বীপের পাত্তা পাওয়া অসম্ভব নয়।

সতীশবাবু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, ঠিক, ঠিক, ঠিক!

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চলুক ছেলেচোরদের সর্দারের সন্ধান। কি বলেন?

আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? যা বলবার তা তো আপনিই বাতলে দিচ্ছেন?

কিন্তু আপাতত আমাদের আবিষ্কার আমাদের মধ্যেই ধামাচাপা থাক।

.

ষষ্ঠ । দুর্জয়গড়ের উদারতা

তিনদিন কেটে গেল। ছেলেচোরদের সম্বন্ধে আর নতুন কিছুই জানা গেল না।

হেমন্তের সমস্ত মস্তিষ্ক-জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে আমেরিকা-ফেরত এক অদেখা অজানা শৌখীন ব্যক্তি এবং মোহন-নামক কোনও অচেনা দ্বীপ!

কিন্তু অনেক মাথা খাঁটিয়েও কোনওরকম সুরাহা হল না; আমেরিকার ভদ্রলোক করতে লাগলেন পুরোদস্তুর অজ্ঞাতবাস এবং মোহনদ্বীপ হয়ে রইল রূপকথারই মায়া-দ্বীপের মতন মিথ্যা।

এর মধ্যে মিঃ গাঙ্গুলির আবির্ভাব হচ্ছে এবেলা-ওবেলা। দোটানায় পড়ে ভদ্রলোকের অবস্থা বড়ই কাহিল হয়ে উঠেছে। ওদিকে পুত্রশোকাতুর মহারাজা, আর এদিকে অচল অটল হেমন্ত। মহারাজা যতই ব্যস্ত হয়ে মিঃ গাঙ্গুলিকে পাঠিয়ে দেন নতুন কোনও আশাপ্রদ তথ্য জানবার জন্যে, হেমন্ত শোনায় ততই নিরাশার কথা, কিংবা কখনও কখনও

হয়ে যায় অক্টোরলনি মনুমেন্টের মতন নিস্তব্ধ। বেশি পীড়াপিড়ি করলে শান্ত মুখে ফুটিয়ে তোলে দ্য ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসার হাসি!

কাল বৈকালে এসে মিঃ গাঙ্গুলি একটা চমকপ্রদ সংবাদ দিয়ে গেছেন।

দুর্জয়গড়ের মহারাজাবাহাদুর পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন! যুবরাজের সন্ধান যে দিতে পারবে ওই পুরস্কার হবে তারই প্রাপ্য।

হেমন্ত বললে,মিঃ গাঙ্গুলি, দুর্জয়গড়ের বার্ষিক আয় কত?

কুড়ি লক্ষ টাকা।

মহারাজ তাহলে দুর্জয়গড়ের যুবরাজের মূল্য স্থির করেছেন, পঁচিশ হাজার টাকা?

পঁচিশ হাজার টাকা! একি বড় দুটিখানি কথা! গাঙ্গুলি বললেন, দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতন বিস্ফারিত করে।

দেখুন মিঃ গাঙ্গুলি, পুরস্কারের ওই পঁচিশ হাজার টাকার ওপরে আমার লোভ হচ্ছে না, একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। কিন্তু যদি কেউ অর্থলোভে যুবরাজকে চুরি করে থাকে তাহলে ওই পঁচিশ হাজার টাকাকে সে তুচ্ছ মনে করবে বোধহয়!

আমি কিন্তু তা মনে করতে পারছি না মশাই! সাধ হচ্ছে, আপনার মতন শখের ডিটেকটিভ সেজে আমিও যুবরাজের সন্ধানে কোমর বেঁধে লেগে যাই! আমার মতে পঁচিশ হাজার টাকাই জীবনকে রঙিন করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট!

মোটেই নয়, মোটেই নয়! যারা যুবরাজকে চুরি করেছে তারা যদি নিষ্ক্রয় আদায় করতে চায়, তাহলে চেয়ে বসবে হয়তো পাঁচ লক্ষ টাকা!

প্রায় কঁদো কাঁদো গলায় গাঙ্গুলি বললেন, এঁ-অ্যাঁ!

দিশ-পনেরো লাখ চাইলেও অবাক হব না!

বাপ! দুর্দান্ত বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় গাঙ্গুলি চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি!

আমি হেসে ফেলে বললুম, ও কি মিঃ গাঙ্গুলি, চোরেরা নিষ্ক্রয় চাইলেও অতগুলো টাকা তো আপনার সিন্দুক থেকে বেরুবে না! আপনি অমন কাতর হচ্ছেন কেন?

আমি কাতর হচ্ছি, মহারাজের মুখ মনে করে।

কেন? যাঁর বিশ লাখ টাকা আয়–

আরে মশাই, এক কোটি টাকা আয় হলেও পঁচিশ হাজার পুরস্কার ঘোষণা করা আমাদের মহারাজের পক্ষে অশ্রুতপূর্ব উদারতা!

ও! তিনি বুঝি একটু

একটু নয় মশাই, একটু নয়,–ওর নাম কী–যতদূর হতে হয়! গেল-বছরে মহারাজা তার মাতৃশ্রাদ্ধ সেরেছিলেন তিন হাজার টাকায়! বুঝেছেন মশাই, মাত্র তিন হাজার টাকা– বাপ-মায়ের কাজে বাঙালি গৃহস্থরাও যা অনায়াসে ব্যয় করে থাকে!

আমি বিপুল বিস্ময়ে বললুম, কী বলছেন! এত বড় ডাকসাইটে মহারাজা–

ওই মশাই, ওই! নামের ডাকে গগন ফাটে, কিন্তু মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

হেমন্ত বললে, কিন্তু, শুনেছি মহারাজাবাহাদুর প্রায় ফি-বছরেই ইউরোপ-আমেরিকার বেড়াতে যান। তার জন্যে তো কম টাকার শ্রাদ্ধ হয় না।

হ্যাঁ, আমাদের মহারাজার একটিমাত্র শখ আছে, আর তা হচ্ছে দেশ-বেড়ানো। কিন্তু কীরকম হাত টেনে, কত কম টাকায় তিনি যে তাঁর ওই শখ মেটান, শুনলে আপনারা

বিশ্বাস করবেন না! আরে দাদা, ছছাঃ ছোঃ! বিলাতি মুল্লুকে গিয়ে তিনি প্রবাদবিখ্যাত Marvellous Eastern King-এর নামে রীতিমতো কলঙ্কলেপন করে আসেন।

তাই নাকি? এমন ব্যাপার!

তবে আর বলছি কি! যুবরাজের জন্যে কেউ যদি পাঁচ লাখ টাকা নিষ্ক্রয় চায়, তাহলে ব্লাড-প্রেশার বেড়ে আমাদের মহারাজ দাঁতকপাটি লেগে মুচ্ছিত হয়ে পড়বেন! আর দশ লাখ। টাকা চাইলে? তিনি হয়তো বলে বসবেন–যুবরাজকে আর ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই! সুতরাং দুর্জয়গড়ের যুবরাজের জন্যে তিনি যে পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, এটা তো রূপকথার মতন অসম্ভব কথা!

তাহলে বলতে হবে, যুবরাজের জন্যে মহারাজের বিশেষ প্রাণের টান নেই!

টান আছে মশাই, টান আছে! পুত্রের শোকে তিনি পাগলের মতন হয়ে গেছেন! তবে ছেলের শোকে বড়জোর তিনি পাগল হতে পারেন, কিন্তু টাকার শোকে তার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়!

আপনারা নিয়মিত মাইনে-টাইনে পান তো?

তা পাইনা বললে পাপ হবে। মহারাজা যাকে যা দেব বলেন, ঠিক নিয়মিতভাবেই দেন। কিন্তু অতবড় করদ মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমি, মাইনে কত পাই জানেন? মাসে দেড়শোটি টাকা!

তারপর খানিকক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা কইলুম না।

গাঙ্গুলি বললেন, আজ আবার আর-এক ফাসাদে পড়েছি মশাই! রবীনবাবু হয়তো আমার একটু উপকার করতে পারবেন।

আমি বললুম, আদেশ করুন।

আদেশ নয়, অনুরোধ। মহারাজা বাংলা কাগজগুলোয় ওই পঁচিশ হাজার পুরস্কারের জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চান। সেটা লেখবার ভার পড়েছে, আমার ওপরে। রবীনবাবু তো মস্ত লেখক, খুব অল্প কথায় কীভাবে লিখলে বিজ্ঞাপনটা বড় না হয়-অর্থাৎ খরচ হয় কম-সেটা উনি নিশ্চয়ই বলে দিতে পারবেন। আমি মশাই মাতৃভাষায় একেবারে বিদ্যাদিগজ, কলম ধরেছি কি গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি!

আমি হেসে বললুম, বেশ তো, আমি বলে যাই–আপনি লিখে যান!

আমি মুখে-মুখে বিজ্ঞাপন রচনা করতে লাগলুম, গাঙ্গুলি সেটা লিখে নিয়ে বললেন, তার পরেও আর-এক বিপদ আছে। মহারাজার হুকুম হয়েছে, বাংলাদেশের সমস্ত প্রধান প্রধান দৈনিক আর সাপ্তাহিকে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করতে হবে। কিন্তু কাগজওয়ালারা হচ্ছে অন্য জগতের বাসিন্দা, সব কাগজের নাম-ধাম আমি জানি না তো!

আমি বললুম, তা শহরে প্রধান প্রধান দৈনিক আর সাপ্তাহিকের সংখ্যা পনেরো-বিশখানার কম নয়। তাদের নামধামও আমি জানি।

গাঙ্গুলি সভয়ে বলে উঠলেন, এই রে, তবেই সেরেছে!

কী ব্যাপার? ভয় পেলেন কেন?

ভয় পাব না, বলেন কী? দুর্জয়গড় তো বাংলাদেশ নয়, সেখানে বাঙালি কর্মচারী বলতে সবে ধন নীলমণি একমাত্র আমি। পনেরো বিশখানা বিজ্ঞাপন আমাকে যদি নিজের হাতে copy করতে হয়–

হেমন্ত হেসে বললে, নির্ভয় হোন্ মিঃ গাঙ্গুলি! বিজ্ঞাপনটা এখানেই রেখে যান, copy করবার লোক আমার আছে!

একগাল হেসে মিঃ গাঙ্গুলি বললেন, আঃ বাঁচলুম! আপনার মঙ্গল হোক! এই টেবিলের ওপরে রইল কাগজখানা। বৈকালে এর copy গুলো আর কাগজের নাম ঠিকানা নেওয়ার জন্যে আমি তোক পাঠিয়ে দেব। তাহলে আসি এখন? নমস্কার!

গাঙ্গুলি দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কিন্তু দেখবেন মশাই, আমার মুখে মহারাজার যে চরিত্র-বিশ্লেষণ শুনলেন, সেটা যেন–

আমি হেসে উঠে বললুম, ভয় নেই, সেকথা আমরা মহারাজকে বলে দেব না!

গাঙ্গুলি প্রস্থান করলেন। হেমন্ত বিজ্ঞাপনটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগল। মিনিট দুয়েক পরে তারিফ করে বললে, চমৎকার, চমৎকার।

আমি একটু গর্বিত স্বরে বললুম, কি হে, আমার বিজ্ঞাপনের ভাষাটা তাহলে তোমার ভালো লেগেছে?

আমার আত্মপ্রসাদের উপরে ঠান্ডা জল নিক্ষেপ করে হেমন্ত প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললে, মোটেই না, মোটেই না!

তবে তুমি চমৎকার বললে বড় যে?

আমি মিঃ গাঙ্গুলির হাতের লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। চমৎকার, চমৎকার!

রাগে আমার গা যেন জ্বলতে লাগল।

.

সপ্তম । ছেলে-ধরার লিখন

হেমন্তের সঙ্গে আজ আমিও মহারাজাবাহাদুরের ওখানে গিয়েছিলুম।

যুবরাজের জন্যে মহারাজা এমন অস্থির হয়ে উঠেছেন যে, হেমন্তকে বাধ্য হয়ে তার কাছে যেতে হল।

মহারাজা প্রথমেই জানতে চাইলেন, তদন্ত কতদূর অগ্রসর হয়েছে।

হেমন্ত গুপ্তকথা কিছুতেই ভাঙলে না। কেবল বললে, সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে এবং তার চেষ্টা হয়তো ব্যর্থ হবে না।

এরকম উড়ো কথায় মহারাজা খুশি হলেন না, রাগ করে বাঙালি পুলিশ ও গোয়েন্দাদের উপরে কতকগুলো মানহানিকর বিশেষণ প্রয়োগ করলেন।

পুত্রবিচ্ছেদে ব্যাকুল মহারাজার এই বিরক্তি হেমন্ত নিজের গায়ে মাখলে না, হাসিমুখে বিদায় নিয়ে চলে এল।

হেমন্তের বাড়িতে এসে দেখি, তার বৈঠকখানার ভিতরে সতীশবাবু ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতোই এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত ছুটোছুটি করছেন।

হেমন্তকে দেখেই বলে উঠলেন, বেশ মশাই, বেশ! এদিকে এই ভয়ানক কাণ্ড, আর ওদিকে আপনি দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন?

হেমন্ত হেসে বললে, হাওয়া খেতে নয় সতীশবাবু, গালাগাল খেতে গিয়েছিলুম!

মানে?

মানে, দুর্জয়গড়ের মহারাজাবাহাদুরের মতে দুনিয়ায় অকর্মণ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ হচ্ছে বাঙালি পুলিশ আর

আরে, রেখে দিন আপনার দুর্জয়গড়ের তর্জন-গর্জন! এদিকে ব্যাপার কি জানেন?

প্রকাশ করুন।

আপনার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হল। শ্যামলপুরের জমিদারের কাছে ছেলেচোরদের চিঠি এসেছে।

কমলাকান্ত রায়চৌধুরীর কাছে? তারই একমাত্র পুত্র তো সর্বপ্রথমে চুরি যায়?

হ্যাঁ। এই দেখুন।

সতীশবাবুর হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে হেমন্ত তার কাগজ পরীক্ষা করে বললে, সেই একই কাগজ– Made in Kalifornia! ভালো।

চিঠিখানা সে উচ্চস্বরে পাঠ করলে :

শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত রায়চৌধুরী

সমীপেষু–

মহাশয়,

আমরা দুরাশয় নই। আপনার পুত্র আমাদেরই কাছে আছে। তাহার সমস্ত কুশল।

কিন্তু তাহাকে আর অধিক দিন আমাদের কাছে রাখিতে ইচ্ছা করি না।

পুত্রের মূল্যস্বরূপ মহাশয়কে এক লক্ষ মাত্র টাকা দিতে হইবে। চেক নয়, দশ হাজার টাকার দশখানি নোট দিলেই চলিবে।

আগামী পনেরোই তারিখে রাত্রি দশটার সময়ে টালিগঞ্জের রেলওয়ে ব্রিজের উপরে আমাদের লোক আপনার টাকার জন্য অপেক্ষা করিবে।

মনে রাখিবেন, আপনি যদি পুলিশে খবর দেন এবং আমাদের লোক ধরা পড়ে কিংবা কেহ তাহার পশ্চাৎ-অনুসরণ করে, তাহা হইলে আপনার পুত্রকে হত্যা করিতে আমরা একটুও ইতস্তত করিব না।

যদি যথাসময়ে টাকা পাই, তবে তাহার পর সাত-আট দিনের মধ্যেই আপনার পুত্রকে আমরা বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব। এইটুকু বিশ্বাস আমাদের করিতেই হইবে।

আগামী পনেরোই তারিখে টাকা না পাইলে বুঝিব, মহাশয়ের পুত্রকে ফিরাইয়া লইবার ইচ্ছা নাই। তাহার পর আপনার পুত্রের ভালো- মন্দের জন্যে আমরা দায়ী হইব না।

ইতি–

হেমন্ত বললে, চিঠির তলায় নাম নেই। এ-শ্রেণির ভদ্রলোকেরা বিনয়ের অবতার। নিজেদের নাম জাহির করবার জন্যে মোটেই লালায়িত নন।

সতীশবাবু বললেন, এখন উপায় কি বলুন দেখি?

পনেরোই তো আসছে কাল। কমলাকান্তবাবুর টাকা দেওয়ার শক্তি আছে?

আছে। টাকা তিনি দিতেও চান। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি চান ছেলেচোরদের ধরতেও। সেটা কী করে সম্ভব হয়? চিঠিখানা পড়লেন তো?

হুঁ। চোরদের দূত ধরা পড়লে বা কেউ তার পিছু নিলে কমলাকান্তবাবুর ছেলে বাঁচবে না।

কিন্তু কমলাকান্তবাবু ছেলেকেও বাঁচাতে, অপরাধীদেরও ধরতে চান। এ কিন্তু অসম্ভব বলে বোধ হচ্ছে। কারণ এটাও তিনি বলেছেন যে, ছেলে যতদিন চোরদের হস্তগত থাকবে, ততদিন আমরা কিছুই করতে পারব না।

তাহলে তাদের দূতকে ছেড়ে দিতে হয়।

হ্যাঁ। তারপর যেদিন তারা ছেলে ফিরিয়ে দিতে আসবে সেই দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

না সতীশবাবু, সেটা আরও অনিশ্চিত। অপরাধীরা বড় চালাক। তারা কবে, কখন, কি উপায়ে ছেলে ফিরিয়ে দেবে, সেসব কিছুই জানায়নি। হয়তো তারা বখশিশ দিয়ে পথের কোনও লোককে ডেকে, কমলাকান্তবাবুর ঠিকানায় তার ছেলেকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাকে গ্রেপ্তার করেও আমাদের কোনও লাভ হবে না। যদি আমাদের কিছু করতেই হয়, তবে কাল– অর্থাৎ পনেরোই তারিখেই করতে হবে।

তাহলে অপরাধীদের দূত ধরা পড়বে, কমলাকান্তবাবুর লক্ষ টাকা বাঁচবে, কিন্তু তার ছেলেকে রক্ষা করবে কে?

মাথা খাটালে পৃথিবীর যে-কোনও বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের উপায় আবিষ্কার করা যায়। একটু সবুর করুন সতীশবাবু, আগে চা আসুক, প্রাণ-মন স্নিগ্ধ হোক, তারপর চায়ের পেয়ালায় তুমুল তরঙ্গ তুলতে কতক্ষণ!...ওরে মধু, চা!

যথাসময়ে চা এল। একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে এক সেঁক পান করে হেমন্ত বললে, আ, বাঁচলুম! সক্কালবেলায় দুর্জয়গড়ের চা পান করে দেহের অবস্থা কি কাহিলই হয়ে পড়েছিল!

সতীশবাবু বললেন, সে কী মশাই। রাজবাড়ির চায়ের নিন্দে!

মশাই কি সন্দেহ করেন যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ চা তৈরি হয় কেবল রাজা-রাজড়ার বাড়িতেই? মোটেই নয়, মোটেই নয়! দামি আর খাঁটি চায়নার টি- পটে ঐশ্বর্যের সদর্প বিজ্ঞাপনথাকতে পারে, কিন্তু সুস্বাদু চা যে থাকবেই এমন কোনও বাঁধা আইন নেই। চা যে-সে হাতে তৈরি হয় না। ভালো চা তৈরি করার সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজানোর তুলনা চলে। ও দুটোই যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। এ দুই ক্ষেত্রেই গুণী মেলে একশো-জনে একজন। আমার মধু চাকর হচ্ছে পয়লা নম্বরের চা- কর।

সতীশবাবু বললেন, আপাতত আপনার চায়ের ওপরে এই বক্তৃতাটা বন্ধ করলে ভালো হয় না?

চায়ে শেষ-চুমুক মেরে ইজিচেয়ারে হেলে পড়ে হেমন্ত অর্ধমুদিত নেত্রে বললে, ব্যস্ত হবেন না সতীশবাবু! আমার মুখে বাক্যধারা ঝরছে বটে, কিন্তু আমার মস্তিষ্কের ভেতরে উথলে উঠছে চিন্তার তরঙ্গমালা!

আমরা পুলিশ, প্রমাণ চাই।

প্রমাণ? বেশ, দিচ্ছি! আসছে কাল রাত দশটার সময়ে টালিগঞ্জের রেলওয়ে-ব্রিজের উপরে ছেলেচোরদের দূত আসবে।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কমলাকান্তবাবুর লোক তার হাতে লক্ষ টাকার নোট সমর্পণ করবে।

তারপর?

আমাদের অর্থাৎ পুলিশের চর যাবে তার পিছনে পিছনে।

ধ্যেৎ, পর্বতের মুষিক প্রসব! চোরেদের চিঠিতে–

কি লেখা আছে আমি তা ভুলিনি মশাই, ভুলিনি। পুলিশের চর এমনভাবে দূতের পিছনে যাবে, সে একটুও সন্দেহ করতে পারবে না।

দূত যদি অন্ধ আর নির্বোধ না হয়, তাহলে সে ঠিক ধরতে পারবে, কে তার পিছু নিয়েছে।

না, ধরতে পারবে না। এখানে আপনারা বিলাতি পুলিশের পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

পদ্ধতিটা কি, শুনি।

রাত দশটার ঢের আগে ঘটনাস্থলের চারিদিকে তফাতে তফাতে দলে দলে গুপ্তচর ঘোরাফেরা করবে। মনে রাখবেন, পাঁচ-দশ জনের কাজ নয়। তারপর যথাসময়ে চোরেদের দূত আসবে, টাকা নেবে, স্বস্থানের দিকে প্রস্থান করবে। দূর থেকে তাকে

অনুসরণ করবে আমাদের প্রথম চর। দূতের লক্ষ্য নিশ্চয়ই তার উপরে পড়বে–পড়ুক, ক্ষতি নেই। আমাদের প্রথম চর খানিক এগিয়েই দেখতে পাবে আর-একজন নতুন লোককে–অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় চরকে। প্রথম চর, দ্বিতীয়কে ইঙ্গিতে দূতকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে পিছিয়ে পড়বে বা অন্য দিকে চলে। যাবে। চোরেদের দূত সেটা দেখে ভাববে, সে মিছেই সন্দেহ করেছিল। ওদিকে আমাদের দ্বিতীয় চর কতকটা পথ পার হয়েই পাবে আমাদের তৃতীয় চরকে। তখন সেও তৃতীয়ের উপরে কার্যভার দিয়ে নিজে সরে পড়বে। এই ভাবে তৃতীয়ের পর চতুর্থ, তারপর দরকার হলে পঞ্চম বা ষষ্ঠ চর চোরেদের দূতের পিছু নিলে সে কিছুই সন্দেহ করতে পারবে না।

চমকার আধুনিক পদ্ধতি। কিন্তু তারপর?

আমাদের আপাতত জানা দরকার কেবল চোরেদের কলকাতার আস্তানাটা। এখন কারুকে গ্রেপ্তার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ চোরেদের কবলে আছে তিন-তিনটি বালক। তারা যে কলকাতায় নেই এটা আমরা জানি। আগে তাদের ঠিকানা বার করি, তারপর অন্য কথা। কলকাতায় চোর ধরতে গিয়ে তাদের যদি মরণের মুখে এগিয়ে দি, তাহলে আমাদের অনুতাপ করতে হবে। রোগী মেরে রোগ সারানোর মানে হয় না।

.

অষ্টম । গল্পস্বল্প

কাল গেছে পনেরোই তারিখ। রাত দশটার সময়ে কাল টালিগঞ্জে নিশ্চয়ই একটা কিছু রোমাঞ্চকর নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে। খবরটা জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে মন।

সতীশবাবু কাল রাতেই খবর দিতে আসবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু হেমন্ত রাজি হয়নি। সে বললে, আপনি হয়তো আসবেন রাত বারোটার সময়ে। কিন্তু আপনার খবরের চেয়ে। আমার ঘুমকে আমি বেশি মূল্যবান মনে করি। রাতের পর সকাল আছে, এর মধ্যেই খবরটা বাসি হয়ে যাবে না নিশ্চয়।

যথাসময়ে শয্যাত্যাগ, আহার ও নিদ্রা-হেমন্ত সাধ্যমতো এ-নিয়ম রক্ষা করবার চেষ্টা করত। অথচ জরুরি কাজের চাপ পড়লে তাকেই দেখেছি দুই-তিন রাত্রি বিনা নিদ্রায় অনায়াসেই কাটিয়ে দিতে।

সে বলত, নিয়ম মেনে শরীরধর্ম পালন করি বলেই আমার দেহের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে reserved শক্তি। যারা অনিয়মের মধ্যেই জীবন কাটায় তাদের দেহে কেবল রোগ এসেই বাসা বাঁধে না– reserved শক্তি থেকেও তারা হয় বঞ্চিত।

সকালে বসে হেমন্তের সঙ্গে গল্প করছিলুম। হেমন্ত বলছিল, মানুষের জীবনে দৈবের প্রভাব যে কতখানি, আমরা কেউই সেটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করি না। গোটাকয়েক দৃষ্টান্ত দি, দেখ। প্রথমে ধর–আলেকজান্ডার দি গ্রেটের কথা। তিনি মারা গিয়েছিলেন যৌবনেই। অল্প বয়সে সিংহাসন পেয়েছিলেন বলে হাতে পেলেন তিনি অসীম ক্ষমতা আর তাঁর পিতার হাতে তৈরি সুশিক্ষিত সৈন্যদল। তাঁর পিতা রাজা ফিলিপ অসময়ে দৈবগতিকে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দেন। সে-সময়ে তিনি যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, যদি বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত রাজ্যচালনা করতেন, তাহলে আলেকজান্ডার কখনও দিগ্বিজয়ী নাম কেনবার অবসর পেতেন কিনা সন্দেহ! ...ভেবে দেখ, বিলাতের বালক কবি চ্যাটার্টনের কথা। সবাই বলে, দরিদ্রের ঘরে না জন্মালে তিনি তখনকার ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতেন। পৃথিবীর অনেক কবিই ধনী বা রাজার কৃপাদৃষ্টি লাভ করে লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করে সরস্বতীর সেবা করে গেছেন যোড়শোপচারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও চ্যাটার্টন দৈবের সাহায্য লাভ করেননি। ফলে অনাহারের জ্বালা সইতে না পেরে বালক-বয়সেই তিনি করলেন আত্মহত্যা–অতবড় প্রতিভার ফুল শুকিয়ে গেল ফোটবার আগেই।... রোম সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী থিয়োডোরার কথা মনে করো। তিনি ছিলেন অজানা অনামা বংশের মেয়ে, পথের ধুলোয় পড়ে কাটত তার দিন। দৈবের মহিমায় হঠাৎ একদিন সম্রাটের সুনজরে পড়ে থিয়োডোরা হলেন সম্রাজ্ঞী! এমনই কত আর নাম করব? রবীন, আজ যাদের তুমি নিম্নশ্রেণির অপরাধী বলে জানো, খোঁজ নিলে দেখবে–তাদের অনেকেই হয়তো দৈবের হাতের খেলনা হয়ে এমন ঘৃণ্য নাম কিনেছে। দৈবগতিকে তাদের অজ্ঞাতসারেই তারা

যদি একটি বিশেষ ঘটনার আবর্তের মধ্যে গিয়ে না পড়ত তাহলে আজ তারা বাস করতে পারত সমাজের উচ্চ-স্তরেই। আবার দেখ, আমাদের দলের অনেকেই বিখ্যাত ডিটেকটিভ হয়ে ওঠে, খুব রহস্যময় মামলারও কিনারা করে ফেলে, কিন্তু তারও মূলে থাকে দৈবের খেলাই। আপাতত যে-মামলাটা আমরা হাতে নিয়েছি, এখনও সেটার কোনও কিনারা হয়নি বটে, কিন্তু এখনই দৈব আমাদের সহায়। হয়েছে।

তুমি সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা সেই বিজ্ঞাপনটার কথা বলছ বোধ হয়?

হ্যাঁ। এ মামলায় সেইটেই হচ্ছে starting point, দৈব যদি আমার সহায় হয়ে ওই সূত্রটাকে এগিয়ে না দিত, তাহলে আমি এ-মামলার কিনারা করবার কোনও আশাই করতে পারতুম না। খালি বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকলেই হয় না রবীন, সেইসঙ্গে চাই দৈবের দয়া। তুমি দেখে নিও, এই মামলার অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ হবে সেই সাঙ্কেতিক বিজ্ঞাপনটাই।

অপরাধী যে ধরা পড়বে, এবিষয়ে তোমার কোনও সন্দেহই নেই?

এক তিলও না। যে-কোনও দেশের পুলিশের দপ্তর দেখলে তুমি আর-একটা সত্যকথা জানতে পারবে।

কী?

অতিরিক্ত চালাকি দেখাতে গিয়ে আজ পর্যন্ত কত বড় বড় অপরাধী পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। ধরো, এই ছেলে-চোরের কথা। ডাকঘরের সাহায্য নিলে আমাদের পক্ষে আজ একে আবিষ্কার করা অসম্ভব হত। ডাকের চিঠিতেও সে সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারত, সে চিঠি ভুল ঠিকানায় গেলে বা পুলিশের হাতে পড়লেও খুব-সম্ভব কেউ তার পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করত না।

ঠিক এই সময়ে রাস্তায় মোটর দাঁড়ানোর শব্দ হল। অনতিবিলম্বে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালেন সতীশবাবু–চোখে-মুখে তার হাসির উচ্ছ্বাস!

কী মশাই, খবর কি? কেল্লা ফতে!

.

নবম । সর্দারের বাহাদুরি

হেমন্ত বললে, কেল্লা ফতে কীরকম? আপনি কি আসল আসামিকেও ধরে ফেলেছেন?

সতীশবাবু বললেন, পাগল! নিজের দিক না সামলে ভীমরুলের চাকে হাত দি কখনও?

তবে?

তাদের আড্ডা আবিষ্কার করেছি।

কী করে?

আপনার ফন্দিটা কাজে লাগিয়ে। হেমন্তবাবু, এমনই নবনবউন্মেষশালিনী বুদ্ধি দেখিয়েই তো আপনি আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছেন। আপনার ফন্দিটা কাজ করেছে ঘড়ির কাঁটার মতো, চোরেদের দূত কোনও সন্দেহ করতে পারেনি।

ফন্দিটা আমার নয় সতীশবাবু, ওটা আমি শিখে এসেছি বিলাত থেকে। কিন্তু যাক সে কথা। এখন আপনার কথা বলুন।

সতীশবাবু টুপি খুলে বসে পড়ে বললেন, ওদের দূত যথাস্থানেই এসেছিল।

তারপর সে টাকা নিয়েছে?

হ্যাঁ। তারপর আমাদের চরনা, চর বললে ঠিক হবে না–চরেরা তার পিছু নেয়।

সে কোনদিকে যায়?

রসা রোড ধরে আসে উত্তর দিকে। তারপর প্রায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের মোড়ের কাছে এসে একখানা মস্ত বাড়ির ভিতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়।

বাড়িখানার উপরে পাহারা বসিয়েছেন তো?

নিশ্চয়! বাড়িখানার নাম মনসা ম্যানস–অন্ধকার, বাহির থেকে মনে হয় না ভিতরে মানুষ আছে।

যে লোকটা এসেছিল তাকে দেখতে কেমন?

রাতে ভালো করে তার চেহারা দেখা যায়নি। তবে সে খুব লম্বা-চওড়া আর তার পোশাক হিন্দুস্থানীর মতো।

এইবার গোপনে সন্ধান নিতে হবে যে, ও-বাড়িতে কে থাকে। তারপর–।

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। নিজের কথা অসমাপ্ত রেখেই হেমন্ত উঠে গিয়ে রিসিভার নিয়ে মুহূর্ত-পরে মুখ ফিরিয়ে বললে, সতীশবাবু, থানা থেকে আপনাকে ডাকছে।

সতীশবাবু রিসিভার নিয়ে বললেন, হ্যালো! হ্যাঁ, আমি।...কি বললে? আঁ, বলো কী? বলো কী? তিনি অভিভূতের মতন আরও খানিকক্ষণ থানার কথা শুনলেন, তারপর বদ্ধ-স্বরে আচ্ছা বলে রিসিভারটা রেখে দিয়ে যখন আবার আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চোখের আলো নিভে গেছে এবং ভাবভঙ্গি একেবারে অবসন্নের মতো।

হেমন্ত একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সতীশবাবুর মুখের পানে তাকালে, কিন্তু কিছু বললে না।

সতীশবাবু ধপাস করে চেয়ারের উপরে বসে পড়ে করুণ স্বরে বললেন, হেমন্তবাবু, খাঁচা খালি–পাখি নেই!

পাখি উড়ল কখন?

তিক্তকণ্ঠে সতীশবাবু বললেন, আরে মশাই, পাখি ধরতে গিয়েছিলুম আমরা খালি খাঁচায়! আজ সকালে আমাদের চর খবর নিয়ে জেনেছে যে, মনসা-ম্যানসন হচ্ছে ভাড়াটে বাড়ি, কিন্তু আজ তিনমাস খালি পড়ে আছে!

অর্থাৎ চোরেদের দূত সদর দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে খিড়কির দরজা দিয়ে সরে পড়েছে। কেমন, এই তো?

ঠিক তাই। আমাদের কাদা ঘেঁটে মরাই সার হল!

সর্দারজি, শাবাশ!

সর্দার? সর্দার আবার কে?

এই ছেলেচোরদের সর্দার আর কি। বাহাদুর বটে সে! আমাদের এত শেয়ালের পরামর্শ, এত তোড়জোড়, এত ছুটোছুটি, সাফল্যের লাফালাফি, কালনেমির লঙ্কা ভাগ, তার এক ছেলেভোলানো সহজ চালে সব ব্যর্থ হয়ে গেল! শত্রুর চেয়ে নিজেদের বেশি বুদ্ধিমান মনে করার শাস্তি হচ্ছে এই! আমি মানস-নেত্রে বেশ নিরীক্ষণ করতে পারছি, আমাদের বোকামির দৌড় দেখে সর্দারজি মহাকৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই হাতে পেট চেপে কার্পেটের উপরে গড়াগড়ি খাচ্ছেন! হাস্যে সর্দারজি, হাস্যে! স্বীকার করছি আমরা গর্দভের নিকটাত্মীয়-আমরা হেরে ভূত!

সতীশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, থামুন মশাই, থামুন! এটা ঠাট্টা-তামাশার বিষয় নয়!

হেমন্ত এইবারে জোরে অট্টহাস্য করে বললে, গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে একটা বড় রকমের স্পোর্ট! পরাজয়কে আমি হাসিমুখেই গ্রহণ করতে পারি। যে কখনও পরাজিত হয়নি, সে বিজয়গৌরবেরও যথার্থ মর্যাদা বুঝতে পারে না।

সতীশবাবু ভার-ভার মুখে বললেন, খেলা? বেশ, কেমন খেলোয়াড় কে, দেখা যাবে। আপনার ওই সর্দারজি এখনও টের পাননি যে, আমাদের হাতের তাস এখনও ফুরিয়ে যায়নি! দেখি টেক্কা মারে কে!

হেমন্ত হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, আমাদের হাতে এখনও কী কী তাস আছে মশাই? নতুন কোনও তাস পেয়েছেন নাকি?

নিশ্চয়। সে-খবরটাও আজ দিতে এসেছি। জবর খবর!

বলেন কী–বলেন কী? ঝাড়ুন আপনার জবর খবরের ঝুলি!

হেমন্তের উৎসাহ দেখে সতীশবাবুর ম্লান ভাবটা মুছে গেল ধীরে ধীরে। তিনি বললেন, এ খবরটা যে পেয়েছি তারও মূলে আছেন আপনি, কারণ এদিকেও আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

হেমন্ত বলে উঠল ওহো, বুঝেছি!

না, কখনও বোঝেননি!

নিশ্চয় বুঝেছি!

কী করে বুঝলেন?

অনুমানে।

কী বুঝেছেন?

ক্যানিংয়ের এক মাঝির খোঁজ পেয়েছেন?

ঠিক!

জানি। কলকাতায় পাখির খাঁচা যখন খালি, জবর খবর আসতে পারে তখন কেবল ক্যানিং থেকেই।

তাই। খবরটা পেয়েছি কাল রাতেই।

খবরটা শুনি।

পুলিশ খোঁজাখুঁজি করে জলিল নামে এক বুড়ো মাঝিকে বার করেছে। সে নাকি আজ তিনমাসের ভিতরে চারবার এক-একদল লোককে নিয়ে সমুদ্রের মুখে জামিরা নদীর একটা দ্বীপে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। আবার আসবার সময়ে ওই দ্বীপ থেকেও যাত্রী তুলে এনেছে।

তারা যে সন্দেহজনক ব্যক্তি, এটা মনে করছেন কেন?

তারও কারণ আছে। প্রথমত, জলিল বলে, ও-অঞ্চলে সে আগেও গিয়েছে, কিন্তু ওই দ্বীপে যে মানুষ থাকে এটা তার জানা ছিল না। দ্বিতীয়ত, লোকগুলো যতবার গিয়েছে এসেছে, ততবারই তাকে প্রচুর বখশিশ দিয়ে বলেছে, তাদের কথা সে যেন আর কারুর কাছে প্রকাশ না করে। এটা কি সন্দেহজনক নয়?

এ প্রমাণ সন্দেহজনক হলেও খুব বেশি সন্তোষজনক নয়।

শুনুন, আরও আছে। গত দোসরা তারিখে দুর্জয়গড়ের যুবরাজ হারিয়ে গেছেন, একথা মনে আছে তো? তেসরা তারিখের খুব ভোরে-অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগেই চারজন লোক জামিরা নদীর ওই দ্বীপে যাওয়ার জন্যে জলিলের নৌকো ভাড়া করে। তাদের সঙ্গে ছিল। একটি বছর-চার বয়সের সুন্দর শিশু। জলিল বলে, শিশুটি ঘুমোচ্ছিল আর সারা পথ সে। তার সাড়া পায়নি, নৌকোর ভিতরেই তাকে লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। নৌকোর যাত্রীরা জলিলকে বলেছিল, শিশু অসুস্থ। কিন্তু আমার বিশ্বাস তাকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল কোনওরকম ঔষধ প্রয়োগেই। ...কি বলেন হেমন্তবাবু, ওই শিশুই যে দুর্জয়গড়ের যুবরাজ, একথা কি আপনার মনে লাগে?

হেমন্তের মুখের ভাবান্তর হল না। সে মিনিট তিনেক স্থির হয়ে বসে রইল নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখার মতো। তারপর আচম্বিতে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে সতীশবাবুর একখানা হাত সজোরে চেপে ধরে বললে, উঠুন-উঠুন, এইবারে চাই action!

সতীশবাবু আর্তস্বরে বললেন, আরে মশাই, হাত ছাড়ুন-হাত ছাড়ুন, গেল যে! হাতখানার দফা-রফা হল যে!

হেমন্ত তাড়াতাড়ি সতীশবাবুর হাত ছেড়ে দিলে।

সতীশবাবু হাতখানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ওঃ! আপনারা দুই বন্ধু যে ভদ্র-গুন্ডা, তা আমি জানি মশাই, জানি! কুস্তিতে, বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, তাও খবরের কাগজে পড়েছি। কিন্তু যত তাল আমার ওপরে কেন, আমি কি জামিরা নদীর মোহনদ্বীপের ছেলে-ধরা?...কি রবীনবাবু, মুখ টিপে টিপে হাসা হচ্ছে যে বড়? আপনিও এগিয়ে আসুন না, action বলে গর্জন করে আমার আর-একখানা হাত ভেঙে দিন না!

আমি হেসে ফেলে বললুম, ও-অভিপ্রায় আমার আছে বলে মনে হচ্ছে না!

হেমন্ত লজ্জিতমুখে বললে, ক্ষমা করবেন সতীশবাবু, মনের আবেগটা আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেল!

বাপ! ভবিষ্যতে মনের আবেগ মনের মধ্যেই চেপে রাখলে বাধিত হব।...হ্যাঁ, এখন কি বলতে চান, বলুন! কিন্তু কাছে আসবেন না, আপনি উত্তেজিত হয়েছেন!

হেমন্ত বললে, আজই মোহনদ্বীপের দিকে নৌকো ভাসাতে হবে!

.

দশম । শাপভ্রষ্ট দ্রৌপদী

সতীশবাবু একটু ভাবলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তা হয় না হেমন্তবাবু।

কেন হয় না?

কেবল যে যাত্রার আয়োজন করতে হবে, তা নয়। আমার হাতে আরও গুরুতর কাজ আছে, সেগুলোর ব্যবস্থা না করে আমার কলকাতা ছাড়া অসম্ভব!

তবে কবে যেতে পারবেন?

চেষ্টা করলে কাল যেতে পারি।

বেশ, তাই। কিন্তু সঙ্গে বেশি লোকজন নেবেন না।

যাচ্ছি বাঘের বাসায়, বেশি লোকজন নেব না মানে?

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। শত্রুদেরও চর থাকতে পারে, তারাও আমাদের ওপরে যে নজর রাখছে না, একথা বলা যায় না। একটা বিপুল জনতা যদি ক্যানিংয়ের ওপরে ভেঙে পড়ে, তাহলে মোহনদ্বীপেও গিয়ে হয়তো দেখব, পাখিরা বাসা ছেড়ে উড়ে পালিয়েছে!

সেকথা সত্যি। কিন্তু দলে হালকা হয়েও সেখানে যাওয়া তো নিরাপদ নয়! কে জানে তারা কত লোক সেখানে আছে?

ভারে কাটার চেয়ে ধরে কাটা ভালো। আমরা কাল রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে জন-বারো লোক মিলে দুখানা নৌকোর চেপে যাত্রা করব। আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। সঙ্গে যাদের নেবেন তারা যেন বাছা-বাছা হয়। অবশ্য সকলকেই সশস্ত্র হয়ে যেতে হবে।

কিন্তু চাকর-বামুনও তো নিয়ে যাওয়া দরকার? আমাদের কাজ করবে কে?

চাকর-বামুন? খেপেছেন নাকি? আমরা নিজেরাই হব নিজেদের চাকর, আর রান্নার ভার নেবে, রবীন।

রবীনবাবু? উনি তো কবি, খালি কলম নাড়েন, হাতা-খুন্তি নাড়বার শক্তি ওঁর আছে নাকি?

ভয় নেই সতীশবাবু, হাতা-খুন্তি নেড়ে রবীন যে হাঁড়ি কড়ার ভেতরেই বস্তুহীন কবিতা রচনার চেষ্টা করবে না, সেকথা আমি জোর-গলায় বলতে পারি। রবীনকে চেনেন না বলেই আপনি এত ভাবছেন! কিন্তু ও খালি গোলাপফুল দেখে গোলাপি ছড়া বাঁধে না, কুমড়ো ফুল চয়ন করে বেসম সহযোগে ফুলুরি বানাতেও ও কম ওস্তাদ নয়! ও বোধহয় সাপভ্রষ্ট দ্রৌপদী, পুরুষ দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে মর্ত্যধামে!

হ্যাঁ রবীনবাবু, এসব কি সত্যি? হরি আর হরের মতো আপনিও কি একসঙ্গে কবি আর cook?

আমি বললুম, হেমন্তের অত্যুক্তির কথা ছেড়ে দিন–ওর জীবনের সেরা আনন্দ হচ্ছে আমাকে নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করা। কিন্তু কবি আর লেখকরা যে রাঁধতে জানেন না, আপনার এমন বিশ্বাস কেন হল? ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক আলেকজান্ডার ডুমার নাম শুনেছেন?

ওই যিনি মন্টি ক্রিস্টো আর থ্রি মাস্কেটিয়ার্স লিখেছেন?

হ্যাঁ। তার এক হাতে থাকত কলম, আর এক হাতে হাতা। একসঙ্গে তিনি মনের আর দেহের প্রথম শ্রেণির খোরাক জোগাতে পারতেন!

ঠিক এই সময় আবার একখানা মোটর আমাদের বাড়ির দরজায় এসে থামল, সশব্দে। তারপরেই দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন মিঃ গাঙ্গুলির দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

সতীশবাবু বললেন, মিঃ গাঙ্গুলি, আপনার মুখ-চোখ অমনধারা কেন?

গাঙ্গুলি বললেন, আপনাকে আমি চারিদিকে খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর আপনি কিনা, এখানে বসে ষড়যন্ত্র করছেন!

সতীশবাবু বললেন, ভুল হল মিঃ গাঙ্গুলি! পুলিশ ষড়যন্ত্র করে না, ষড়যন্ত্র ধরে! কিন্তু আপনাকে দেখে যে বিপদগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে!

গাঙ্গুলি একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললেন, বিপদ বলে বিপদ। মহারাজাবাহাদুর একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন!

কেন, কেন?

হেমন্তবাবু, শেষটা আপনার কথাই সত্যি হল! হেমন্ত বিস্মিতকণ্ঠে বললে, আমার কথা সত্যি হল? সে আবার কী?

চোর ব্যাটারা পনেরো লক্ষ টাকার দাবি করে মহারাজাবাহাদুরকে বিষম এক পত্রাঘাত করেছে! ব্যাটারা খালি চোর নয়–গুন্ডা, খুনে, ডাকু!

সতীশবাবু লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ, কী সর্বনাশ!

হেমন্ত কোনওরকম বিস্ময় প্রকাশ করলে না। খালি বললে, চিঠিখানা কোথায়?

এই যে, আমার কাছে। পকেট থেকে পত্র বার করে তিনি হেমন্তের হাতে দিলেন।

হেমন্ত চেঁচিয়ে ইংরেজিতে টাইপ করা যে চিঠিখানা পড়লে, তার বাংলা মানে দাঁড়ায় এই :

মহারাজাবাহাদুর,

যুবরাজকে যদি ফেরত চান তাহলে আগামী চব্বিশ তারিখে আমাদের দূতের হাতে পনেরো লক্ষ টাকা অর্পণ করবেন।

চব্বিশ তারিখে রাত্রি ঠিক বারোটার সময়ে গড়িয়াহাটা লেকের লেক ক্লাবের পিছনকার রাস্তায় আমাদের দূত অপেক্ষা করবে।

কিন্তু সাবধান, যদি পুলিশে খবর দেন, কিংবা আমাদের দূতকে ধরবার বা তার পিছনে আসবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমরা যুবরাজকে হত্যা করতে বাধ্য হব।

পনেরো লক্ষ টাকা আমাদের হস্তগত হওয়ার পর এক সপ্তাহের মধ্যে। যুবরাজকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে পাবেন। আমরা টাকা না পেলে যুবরাজের জীবনাশঙ্কা আছে।

ইতি–

সতীশবাবু বললেন, প্রায় একই-রকম চিঠি। কেবল এখানা ইংরেজিতে লেখা আর টাইপ করা।

বিষম চমকে উঠে গাঙ্গুলি বললেন, ও বাবা, এরকম আরও চিঠি আপনারা পেয়েছেন নাকি?

হেমন্ত বললে, হ্যাঁ। এমনি এক চিঠি লিখে ভয় দেখিয়ে ছেলেধরারা শ্যামলপুরের জমিদারেরও কাছ থেকে এক লাখ টাকা নিয়ে গেছে।

আর আপনারা হাত গুটিয়ে সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন?

সতীশবাবু বললেন, চোরের শর্তগুলো ভুলে যাচ্ছেন কেন? আমাদের কি হাত বার করবার উপায় আছে?

হুঁ, তাও বটে–তাও বটে! একটু গোলমাল করলেই ছুঁচোরা আবার ছেলে খুন করব। বলে ভয় দেখায়! তা পারে, বেটারা সব পারে–গুন্ডা, খুনে, ডাকু! এই এক চিঠিই আমাদের অতবড় মহারাজাবাহাদুরকে একদম কাত করে দিয়েছে–যাকে বলে প্রপাত ধরণীতলে আর কি!

সতীশবাবু বললেন, আজ ষোলোই। আর সাতদিন পরেই চব্বিশ।

হেমন্ত বললে, মহারাজা কি করবেন স্থির করেছেন? পুলিশে যখন খবর দিয়েছেন, তাঁর কি টাকা দেওয়ার ইচ্ছে নেই?

গাঙ্গুলি দুই চেখ বড় করে বললেন, ইচ্ছে? এক কথায় পনেরো লক্ষ টাকা জলে দেওয়ার ইচ্ছে হবে আমাদের মহারাজার? বলেন কি মশাই? কিন্তু এখন তাকে দেখলে আপনাদের দুঃখ হবে। একসঙ্গে ছেলে হারাবার আর টাকা হারাবার ভয়ে একেবারে তিনি ভেঙে পড়েছেন, কী করবেন বুঝতে না পেরে আপনাকে আর সতীশবাবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

সতীশবাবু বললেন, আমরা যাচ্ছি বটে, কিন্তু দিতে পারি খালি এক পরামর্শ। যুবরাজকে বাঁচাতে হলে টাকা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কথাটা গাঙ্গুলির মনের মতো হল না। মাথা নেড়ে বললেন, না মশাই, ও-পাপীদের কথায় বিশ্বাস নেই। তারপর অতগুলো টাকা হাতিয়েও যুবরাজকে যদি ছেড়ে না দেয়?

হেমন্ত বললে, তবু ওদের কথামতোই কাজ করতে হবে।

.

একাদশ

ইস্টকময়ী কলিকাতা-নগরীর কঠোর বুকের ভিতর থেকে একেবারে এসে পড়েছি নদীর কল সঙ্গীতে জীবন্ত প্রকৃতির কোলে। চিরদিন কাব্যচর্চা করি। এখানে এসে মনে হচ্ছে, ফিরে এসেছি যেন স্বদেশে।

এর মধ্যে বলবার মতন ঘটনা কিছুই ঘটেনি। যতক্ষণ কলকাতায় ছিলুম, মহারাজাবাহাদুরের হাহুতাশ-বাণী বহন করে মিঃ গাঙ্গুলি এসে আক্রমণ করেছেন বারংবার এবং কালকের ও আজকের দুপুরের মধ্যে হেমন্তকে বাধ্য হয়ে রাজবাড়িতে ছুটতে হয়েছে পাঁচবার। মহারাজের কথা কিন্তু সেই একই : হয় লাখ-পাঁচেক টাকার

বিনিময়ে যুবরাজকে ফিরিয়ে আনবার ব্যবস্থা করো, নয় অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে যুবরাজকে উদ্ধার করে–পঁচিশ হাজার টাকা পুরস্কারের উপরেও আমি দেব আরও পঁচিশ হাজার টাকা।

মাঝখানে পড়ে গাঙ্গুলি-বেচারার অবস্থা যা হয়েছে। তাঁকে দেখলে দুঃখ হয়। তিনি হচ্ছেন ফিটফাট ব্যক্তি, ইস্তিরি করা পোশাকের প্রতি ভাঁজটি পর্যন্ত অটুট রেখে চলা-ফেরা ওঠা-বসা করেন পরম সাবধানে এবং জামার বোতাম-ঘরে থাকে সর্বদাই একটি করে টাটকা ফুল! কিন্তু ভীষণ অধীর মহারাজাবাহাদুরের ঘন ঘন হুমকি বা হুকুমের চোটে দিকবিদিক জ্ঞানহারার মতন দৌড়ধাপ করে করে মি. গাঙ্গুলির পোশাকের ইস্তিরি গেছে নষ্ট হয়ে এবং বোতামের ফুল গিয়েছে কোথায় ছিটকে পড়ে! যতবারই দেখেছি, ততবারই তিনি হাঁপাচ্ছেন এবং এই শীতেও রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলছেন, পাগলা-রাজার পাল্লায় পড়ে আত্মারাম বুঝি খাঁচা ছাড়া হয়–এ-চাকরি আমার পোষাবে না মশাই, পোষাবে না!

যাক, মহারাজার কবল থেকে মুক্তিলাভ করে আমরাও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। তাকে কোনও খবর না দিয়েই সরে পড়েছি। কেবল মি. গাঙ্গুলিকে চুপিচুপি বলে এসেছি, সতীশবাবু ছুটি পেয়ে চেঞ্জে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আমরাও দু-চার দিনের জন্যে হাওয়াটা একটু বদলে আসছি।

গাঙ্গুলি অত্যন্ত দমে গিয়ে বললেন, আঁ্যা, এই দুঃসময়ে একলা আমাকে মহারাজার খপ্পরে ফেলে আপনারা দেবেন পিঠটান? আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছেন কি?

আমাদের ভাববার দরকার নেই। জীবের স্বধর্ম আত্মরক্ষা করা। আপনিও আত্মরক্ষা করুন।

আর দুর্জয়গড়ের মামলা?

মহারাজকে বলুন, টাকা দিয়ে যুবরাজকে ফিরিয়ে আনতে। আমরা দু-চারদিনে পরেই এসে আসামিকে ধরবার চেষ্টা করব।

গাঙ্গুলি গজগজ করতে করতে চলে গেলেন, আসামির কথা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাতে চান, ঘামাবেন। আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এ-চাকরি আমি ছেড়ে দেব-বাপ!

যথাসময়ে সদলবলে কলকাতায় ধুলো-ধোঁয়া ধুমধাড়াক্কা পিছনে ফেলে শহর-ছাড়া বিজন পথে এগিয়ে চললুম।

রাত-আঁধারে চুপিচুপি কালো জলে ভাসল আমাদের দুই নৌকো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটেনি–এমনকী আমরা যে-কোনও অপ্রীতিকর ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিনি, এ-বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

জনতার সাড়া নেই, তীরতরুর মর্মর-ছন্দে তাল রেখে বনবাসী বাতাস শোনায় স্নিগ্ধ মাটির আর ঘন-সবুজের গন্ধমাখানো নতুন নতুন গান এবং নদীর জলসায় জলে জলে দুলে দুলে ওঠে কূল-হারানো গতি-বীণার তান। কান পেতে শুনলে মনে হয়, অনন্ত নীলাকাশও তার লুকিয়ে রাখা নীরব বীণার রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলছে কল্পলোকের কোন মৌন-রাগিণীর আলাপ! পৃথিবীর ধুলোর ঠুলিতে যার কান কালা, এ অপূর্ব আলাপ সে শুনতে পায় না তাই এর মর্ম বোঝে, শুধু কবি আর শিশু, ফুলপরি আর পাপিয়া!

এই শীতের ঠান্ডা রাতের সঙ্গে আজ পাপিয়ারা ভাব করতে আসেনি! ফুলপরিরাও কোন তীরে কোনও বনে কোন শিশির-ভিজানো বিছানায় ঘুমিয়ে আছে আর ঠিকানা জানি না, কিন্তু আমার মনের ভিতরে জাগল চিরন্তন শিশুর উল্লাসকলরোল।

নৌকো চলেছে অন্ধকারের কালো-চাদরে গা মুড়ে,–চলেছে নৌকো। দাঁড়ে-দাঁড়ে তালে তালে বাজিয়ে চলেছে নৌকো জলতরঙ্গ-বাজনা। দুকুলের কাহিনি ভুলিয়ে, সামনে অকূলের ইঙ্গিত জাগিয়ে চলেছে নৌকো, ঘুমের দেশে ঘুম-ভাঙানো সংগীতের সুর বুনতে-বুনতে।

তারপর। চাঁদ উঠল দূর-বনের ফাঁকে। মনে হল, পূর্ণপ্রকাশের আগে যেন গাছের ঝিলিমিলির আড়াল থেকে চাঁদ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে নিতে চায়, পৃথিবীর উৎসব-আসরে আজ কত দর্শকের সমাগম হয়েছে!

ছড়িয়ে দিলে কে জলে-জলে মুঠো-মুঠো হিরের কণা! ওপারে নজর চলে না, এপারে দেখা যায় নীল-স্বপ্নমাখানো বন আর বন! কত কত দূর থেকে কোন একলা-পথিকের বাঁশের বাঁশির মৃদু মেঠো-সুর ভেসে আসে যেন আমাদের সঙ্গে কথা কইতে। চাঁদ উঠছে উপরে- আরও উপরে। তার মুখে শীতের মেয়ে কুহেলিকার আদর-মাখা চুমোর ছোঁয়া! যত রাত হয় নদীর আমোদ বাড়ে তত–তার জলের নুপুর বাজে তত জোরে!

দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে অবশেষে জড়িয়ে এল আমার চোখের পাতা।

.

দ্বাদশ । দ্বীপ।

জামিরা নদী। এটা কি নদী, না সমুদ্র?

চেষ্টা করে দেখলে বহুদূরে চোখে পড়ে তীরের ক্ষীণ রেখা। কোনও কোনও দিকে তাও নেই–সেখানে অনন্ত আসন জুড়ে বসেছে অসীম শূন্যতা।

জলে নেই মাটির রং। সমুদ্রের রঙের আভাসে জল-বসন ছুবিয়ে জামিরা চাইছে নতুন রঙে রঙিন হতে।

জলিল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, উই! উই সেই দ্বীপ কর্তা, উই সেই দ্বীপ!

আমি শুধলুম, হ্যাঁ জলিল, ও দ্বীপের নাম কি?

জানি না তো!

জানো না?

ও-দ্বীপের নাম নেই।

ঝোপ-জঙ্গল, বড় বড় গাছ। দ্বীপের দিকে তাকালে আর কিছু দেখা যায় না–আর কিছু দেখবার আশাও আমরা করিনি।

হেমন্ত বললে, ওখানে নৌকো লাগাবার ঘাট আছে?

জলিল মাথা নেড়ে জানালে, না!

যারা তোমায় এখানে নিয়ে আসে, তারা কোথায় নামে?

জলিল আবার মাথা নাড়ে। অর্থাৎ তারও কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই!

আমরা যেখানে খুশি নামব?

হ্যাঁ কর্তা।

আমাদের নৌকো দুখানা দ্বীপের খুব কাছে এসে পড়ল।

সতীশবাবু বললেন, দ্বীপটা কত বড়, তাও তো বুঝতে পারছি না! ওই নিবিড় জঙ্গলের ভেতরে আসল জায়গাটা খুঁজে বার করতে কতক্ষণ লাগবে, কে জানে!

পরে পরে দুখানা নৌকোই তীরে এসে লাগল। প্রথম নৌকোয় ছিলুম আমরা তিনজন–অর্থাৎ আমি, হেমন্ত আর সতীশবাবু। অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও অন্যান্য সমস্ত মালই ঠাসা ছিল আমাদের নৌকোতেই। দ্বিতীয় নৌকোয় ছিল একজন ইনস্পেক্টার, একজন সাব-ইনস্পেক্টার, একজন জমাদার ও আট জল মিলিটারি-পাহারাওয়ালা।

তখন অপরাহ্ণ কাল–চারিদিকে সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণ। পথের অভাবে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হল না, জঙ্গলের আশপাশ দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে পাওয়া গেল একটা মাঠ, লম্বায় চওড়ায় আধ-মাইলের কম হবে না। চারিদিকেই তার উঁচু বনের প্রাচীর।

কিন্তু মানুষের চিহ্ন কোথাও নেই। গাছপালায় বাতাসের নিশ্বাস আর বনে বনে পাখিদের ডাক ছাড়া একটা অমানুষিক নিস্তব্ধতা সর্বত্র এমন একটা অজানা ভাবের সৃষ্টি করেছে যে, এ-দ্বীপ কখনও মানুষের কণ্ঠ শুনেছে বলে মনে হয় না।

সতীশবাবু জমাদারকে ডেকে বললেন, সুজন সিং, যেখান দিয়ে যাচ্ছি ভালো করে চিনে রাখো। কারুর সঙ্গে দেখা না হলে ফিরতে হবে, আবার কারুর সঙ্গে দেখা হলেও

অবস্থাগতিকে হয়তো প্রাণ হাতে করে পালাবার দরকার হবে।

মাঠের মাঝবরাবর এসেছি, হেমন্ত হঠাৎ বলে উঠল, আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সতীশবাবু বললেন, কই, আমি তো কোথাও আশার ছিটেফোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না!

হেমন্ত হাত তুলে একদিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললে, ওই দেখুন!

কী?

ধোঁয়া।

অনেক দূরে অরণ্যের মাথায় কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ক্রমেই উপরদিকে উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সেখানে জেগে উঠল, পুঞ্জ পুঞ্জ ঊর্ধ্বগামী ধূম।

হেমন্ত বললে, ধোঁয়ার জন্ম আগুনে। আর আগুনের জন্ম মানুষের হাতে!

কিন্তু দাবানল জ্বলে আপনি।

ওটা কি মনে হচ্ছে? দাবানলের, না উনুনের ধোঁয়া?

উনুনের।

তবে এগিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি।

সকলেরই মুখ উত্তেজিত। কিন্তু কেউ কোনও কথা কইলে না। নীরবে মাঠের বাকি অংশটা পার হয়ে গভীর এক অরণ্যের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

সতীশবাবু বললেন, আবার যে বন এল!

হেমন্ত বললে, আসুক। বন আমাদের বন্ধুর মতো লুকিয়ে রাখবে।

আমি বললুম, এখানে বনের ভেতরে যে একটি স্বাভাবিক পথের মতো রয়েছে!

হেমন্ত বললে, ভালোই হল। ধোঁয়া দেখেছি উত্তর-পশ্চিমে! পথটাও গিয়েছে ওইদিকে। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো!

পথ দিয়ে এগুতে-এগুতেই মানুষের স্মৃতিচিহ্ন পেলুম। এক জায়গায় পেলুম একটা আধ পোড়া বিড়ি। মাঝে মাঝে শুকনো কাদায় মানুষের পায়ের ছাপ। বুঝলুম, পথটা ব্যবহৃত হয়।

মাইলখানেক অগ্রসর হওয়ার পর হেমন্ত বললে, সতীশবাবু, আর বোধহয় এভাবে এগুনো নিরাপদ নয়। আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি ওই বড় বটগাছটায় চড়ে চারিদিকটা একবার দেখি। সে গাছের তলায় গিয়ে জুতো খুলে ফেললে। তারপর উপরে উঠতে লাগল।

তখন সূর্য পশ্চিম-আকাশের দিকে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে। বেশ কাছ থেকেই শুনলুম, কে যেন কাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। একবার গাভীর গম্ভীর হাম্বা-রবও শোনা গেল!

খানিক পরে হেমন্ত গাছ থেকে নেমে এল।

বললুম, কী দেখলে হেমন্ত?

যা দেখবার, সব! একটা লম্বা একতালা বাড়ি। ঘর আছে বোধহয় খান পাঁচ-ছয়। জনতিনেক লোকও দেখলুম–বেশ লম্বা-চওড়া, কারুর চেহারাই বাঙালি কুমোরের গড়া কার্তিকের মতো নয়। বাড়ির ভেতরে নিশ্চয়ই আরও লোক আছে।

বাড়িখানা এখান থেকে কত দূরে?

খুব কাছে।

অতঃপর কী কর্তব্য?

কিন্তু হেমন্তের সাড়া পাওয়া গেল না। সে নীরবে একবার বটগাছটার চারিপাশ ঘুরে এল। একবার বনের পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে। তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগল। সে এমন গম্ভীর ভাব ধারণ করেছে যে, আমরা কেউ তাকে ডাকতে ভরসা করলুম না।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে কাটল। তারপর হেমন্ত হঠাৎ হাসিমুখে যেন নিজের মনেই বললে, ঠিক, ঠিক হয়েছে!

সতীশবাবু বললেন, কী হয়েছে হেমন্তবাবু? এতক্ষণ কী ভাবছিলেন?

আক্রমণের প্ল্যান!

প্ল্যান?

হ্যাঁ। আমি ভেবে দেখছিলুম কোন উপায়ে রক্তপাত না করেই কাজ হাসিল করা যায়।

তাহলে রক্তপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন?

অসম্ভব কি! এটা তো মুনি-ঋষিদের তপোবন নয়, মানুষ-বাঘের বাসা।

ভেবে কী স্থির করলেন?

আটজন মিলিটারি-পুলিশ বন্দুক নিয়ে এই বটগাছটার আড়ালে এমনভাবে লুকিয়ে থাকুক, যেন ওই পথ থেকে কেউ ওদের দেখতে না পায়। বাকি আমরা ছজনে মিলে ওই বাড়ির কাছে এগিয়ে যাই। তারপর রবীন আর আপনাকে নিয়ে আমি একটু তফাতে গিয়ে কোনও ঝোপ-টোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। তারপর আমাদের বাকি তিনজন, আসামিদের বাড়ির কাছে গিয়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ওদের মধ্যে পড়ে যাবে বিষম সাড়া। আমাদের তিনজন লোক পায়ে পায়ে পিছিয়ে পালাবার ভাবভঙ্গি প্রকাশ করবে। তারপর আসামিরা সদলবলে তাড়া করে এলেই আমাদের লোকরা দ্রুতপদে সত্য-সত্যই পলায়ন করবে বনের পথে। ওরাও তখন নিশ্চয়ই তাদের পিছনে পিছনে ছুটবে–সংখ্যা মোটে তিনজন দেখে ওরা কিছুই ভয় পাবে না। তারপর আমাদের তিনজন লোক এই বটগাছটা পেরিয়ে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হয়েই, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সুমুখ ফিরে বার করবে তাদের রিভলভার এবং তাদের একজন বাজাবে হুইস! সঙ্কেত শুনে সেই মুহূর্তেই আটজন মিলিটারি পুলিশ বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াবে শত্রুদের পিছন দিকে। সামনে তিনটে রিভলভার আর পিছনে আটটা বন্দুক। এ-দেখেও তারা যদি আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে দু-একবার বন্দুক-রিভলভার ছুঁড়লেই তাদের যুদ্ধের সাধ মিটতে দেরি লাগবে না। সতীশবাবু, প্ল্যানটা কি আপনার পছন্দ হচ্ছে?

সতীশবাবু উচ্ছ্বসিতস্বরে বললেন, পছন্দ হচ্ছে না আবার! এক্ষেত্রে এর চেয়ে নিরাপদ প্ল্যান কল্পনাও করা যায় না! এত তাড়াতাড়ি কী করে যে আপনি ফন্দি আবিষ্কার করেন, আমি তো মশাই বুঝতেই পারি না। ধন্যি মানুষ আপনি–জিনিয়াস!

আমি বললুম, আর আমরা ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে বসে বসে কী করব হেমন্ত? তোমার গল্প, না মশাদের ঐকতান শুনব?

হেমন্ত বললে, ও-দুটোর একটাও না! শত্রুরা যেই আমাদের লোকের পিছনে তাড়া করে বনের ভেতর ঢুকবে, আমরাও অমনি ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে ঢুকব ওদের বাড়ির অন্দরে। যদি ওদের দলের দু-তিনজন লোক তখনও সেখানে থাকে, তাহলেও আমাদের তিনটে রিভলভারের সামনে ওরা পোষ না মেনে পারবে না। তারপর আমরা খুঁজে দেখব, কোথায় বন্দি হয়ে আছে কলকাতার হারিয়ে যাওয়া তিনটি ছেলে!

কিন্তু ওদের দলকে বনের ভেতরে গ্রেপ্তার করবার পরেও তো বন্দিদের উদ্ধার করা যেতে পারে?

রবীন, সাবধানের মার নেই। ধরো, শত্রুদের সবাই হয়তো বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে না। গোলমাল দেখে ভয় পেয়ে তারা যদি বন্দিদের নিয়ে বনের ভেতর কোনও গুপ্তস্থানে পালিয়ে যায়, তখন আমরা কী করব?

আমি মুগ্ধ স্বরে বললুম, হেমন্ত এইটুকু সময়ের মধ্যে তুমি সবদিক ভেবে নিয়েছ!

ভাবতে হয় ভাই, ভাবতে হয়! মস্তিষ্ককে যে যথাসময়ে কাজে লাগাতে না পারে, তাকেই পড়তে হয় পদে পদে বিপদে! নাও, আর কথা নয়! সবাই প্রস্তুত হও!

.

ত্রয়োদশ। থার্মিট

আমরা তিন একতলা বাড়ি দেখপেরে একজন

আমরা তিনজনে একটা ঝোপ বেছে নিয়ে তার ভিতরে বসে দেখলুম সামনেই সাদা-কলি দেওয়া একখানা একতলা বাড়ি। দেখলেই বোঝা যায়, বাড়িখানা নতুন।

বাড়ির সদর-দরজার চৌকাঠের উপরে একজন হৃষ্টপুষ্ট লোক বসে হুঁকো টানছে। তার একটু তফাতেই আর- একটা লোক গাভীর দুগ্ধদোহন করছে।

বাড়ির সামনে একটুখানি চাতালের মতন জায়গা। সেখানে চারজন লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে কি কথাবার্তা কইছে।

হেমন্ত ঠিক বলেছে, এদের কারুর চেহারাই কার্তিকের মতো নয়, বরং স্মরণ করিয়ে দেয়, দুর্গা-প্রতিমার মহিষাসুরকে। তাদের জনতিনেককে মনে হল হিন্দুস্থানী বলে।

অনতিবিলম্বেই আমাদের তিনজন লোক বনের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তাদের চেষ্টাও করতে হল না। তারা বাইরে আসবামাত্রই সদর-দরজায় লোকটা সবিস্ময়ে হুঁকোটা পাশে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে হেঁড়ে গলায় হাঁকলে, কে রে! কে রে!

আমাদের লোকেরা দাঁড়িয়ে পড়ল চমকে ও থমকে!

শত্রুদের অন্যান্য লোকেরাও সচকিত দৃষ্টিতে দু-এক মুহূর্ত এমনভাবে তাকিয়ে রইল, যেন আগন্তুকরা আকাশ থেকে খসে পড়া মানুষ!

আমাদের লোকেরা জড়োসড়ো হয়ে পিছোতে লাগল পায়ে-পায়ে।

তারপরেই উঠল মহা হইচই! বাড়ির ভিতর থেকেও আরও চারজন লোক ছুটে এল–তাদের মধ্যে একজনের চেহারা আবার একেবারে যমদূতের মত, যেমন ঢ্যাঙা তেমনি চওড়া।

আমাদের লোকেরা যেন প্রাণের ভয়েই বনের ভিতরে অদৃশ্য হল।

চাতালের উপরে কতকগুলো ছোট-বড় কাটা-বাঁশ পড়েছিল। শত্রুরা টপাটপ সেই বাঁশগুলো তুলে নিয়ে মারমূর্তি হয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে গিয়ে ঢুকল বনের ভিতরে।

হেমন্ত হাসিমুখে বললে, বিনা রিহার্সালে আমাদের লোকেরা প্রথম শ্রেণির অভিনয় করেছে! এখন ওরা শেষ রক্ষা করতে পারলেই হয়!

সতীশবাবু বললেন, কোনও ভয় নেই হেমন্তবাবু! সঙ্গে যাদের এনেছি তারা হচ্ছে। বহুযুদ্ধজয়ী বীর। কিন্তু এইবারে আমরা কি বেরিয়ে পড়ব?

না, আরও মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করা যাক।

মিনিট দুয়েক কাটল।

হেমন্ত বললে, আসুন, সৈন্যহীন রণক্ষেত্রে এইবারে আমাদের বীরত্ব দেখাবার পালা। এত গোলমালেও বাড়ি থেকে যখন আর কেউ বেরুল না, নিশ্চয়ই তখন পথ সাফ! তবু রিভলভারগুলো হাতে নেওয়া ভালো!

সামনের জমিটা পার হলুম। গাভীটা অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে রইল, বোধহয় আমাদের মতন ভদ্রচেহারা এ-অঞ্চলে সে আর কখনও দেখেনি!

বাড়ির ভিতরে জনপ্রাণীর সাড়া নেই। পাঁচখানা ঘরসব ঘরের দরজা খোেলা। প্রত্যেক ঘরেই ঢুকলুম-কোথাও কেউ নেই।

হেমন্ত বারান্দায় বেরিয়ে এসে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না তো!

হঠাৎ শোনা গেল, শিশুর অস্পষ্ট কান্না!

সতীশবাবু চমকে বললেন, ছেলে কাঁদে কোথায়?

আমি দৌড়ে দালানের এককোণে গিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে রয়েছে একটা মস্ত চৌকোণা সমতল লোহার দরজা! হাঁটু গেড়ে বসে হেঁট হয়ে দরজায় কান পেতে বললুম, এইখানে, এইখানে! এরই তলা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে!

দরজার উপরে আঘাত করে বুঝলুম, পুরু লোহার পাত পিটে তৈরি। প্রকাণ্ড কড়ায় প্রকাণ্ড কুলুপ লাগানো।

হতাশ-স্বরে বললুম, এ-কুলুপ ভাঙা অসম্ভব!

এবারে ভিতর থেকে কান্না জাগল একাধিক শিশু-কণ্ঠের! সকাতরে একজন কাঁদছে, ওগো মা গো, ওগো বাবা গো!

সতীশবাবু দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বললেন, দিন-রাত এই কান্না শুনতে শুনতে এরা এখানে বাস করছে! কী পাষণ্ড!

হেমন্ত দরজায় উপরে সজোরে আট-দশবার পদাঘাত করলে। দরজা ঝনঝন করে বেজে উঠল।

আমি বললুম, বৃথা চেষ্টা হেমন্ত! ওই গুন্ডাগুলো ধরা পড়লে তবেই চাবি দিয়ে এ দরজা খোলা যাবে।

হেমন্ত বললে, এখনও তো বনের ভেতরে কোনওই সাড়াশব্দ পাচ্ছি না! যদি ওরা পালিয়ে যায়, তাহলেও কি আমরা এই বন্ধ-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই অভাগা শিশুদের কান্না শুনব?

তা ছাড়া উপায়?

উপায় আমার এই ব্যাগে! বলেই হেমন্ত মাটির উপরে উপুড় হয়ে বসে পড়ল।

হেমন্ত যখনই বাইরে কোনও অ্যাডভেঞ্চারে বেরুত, একটি ব্যাগ তার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত সর্বদাই। তার মধ্যে যে কতরকম বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক রহস্যের উপাদান এবং ছোট ছোট যন্ত্র সাজানো থাকত আমি তাদের হিসাবও জানি না, মর্মও বুঝি না। হেমন্তকে

জিজ্ঞাসা করলে বলত, এটি হচ্ছে আমার ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরি! বলা বাহুল্য, ব্যাগটি আজও আছে তার। হাতে।

সে ব্যাগ খুলে বার করলে কাচের ছিপি আঁটা দুটি ছোট ছোট শিশি।

প্রচণ্ড কৌতূহলী চোখ নিয়ে সতীশবাবু হেঁট হয়ে দেখতে লাগলেন।

হেমন্ত অপেক্ষাকৃত বড় শিশিটার ছিপি খুলে লোহার দরজার একটা কড়ার গোড়ায় খানিকটা লালচে-রঙের চূর্ণ ঢেলে দিলে। তারপর অন্য শিশিটার ভিতর থেকে আর-একরকম চূর্ণ নিয়ে একটা চামচের ভিতরে রাখলে।

ঠিক সেইসময়ে বনের ভিতর থেকে শোনা গেল ধ্রুম, ধ্রুম, ধ্রুম করে পরে-পরে তিনটে বন্দুকের আওয়াজ!

হেমন্ত হাসতে-হাসতে বললে, তাহলে বনবাসী বন্ধুরা বশ মানেননি-সেপাইদের সঙ্গে তাঁরা লড়াই করছেন? বেশ, বেশ! কিন্তু যুদ্ধে জিতে ফিরে এলেও দেখবে, তাদের বন্দিশালা শূন্য পড়ে আছে!...সতীশবাবু, তফাতে সরে যান! রবীন, হঠ যাও!

.

দূর থেকেই দেখলুম, হেমন্ত একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বেলে চামচের চূর্ণের উপরে ধরলে, চূর্ণ জ্বলে উঠল।

তারপরেই সে চামচের জ্বলন্ত চূর্ণটা লোহার দরজায় ছড়ানো চূর্ণের উপরে ফেলে দিয়েই চোখের নিমেষে লাফ মেরে তফাতে সরে এল।

মুহূর্ত-মধ্যে সেখানে জেগে উঠল। একটা চোখ-ধাঁধানো ভীষণ তীব্র অগ্নিশিখা সঙ্গে সঙ্গে চড়-চড় পট-পট শব্দ! বিষম বিস্মিত চোখে আমরা দেখতে লাগলুম, সেই জুলন্ত অংশটা

যেন ক্রমে ক্রমে লোহার দরজার ভিতরে বসে যাচ্ছে! তারপরেই হঠাৎ হুড়মুড়-ঝনাৎ করে একটা শব্দ হল–বুঝলুম, দরজা খুলে নীচে ঝুলে পড়েছে।

আমি ছুটে গিয়ে দেখলুম, লোহার দরজার একটা পাল্লায় যেখানে ছিল কড়ার গোড়া, সেখানটায় রয়েছে একটা এত-বড় ছাদা যে, হাতের মুঠো গলে যায় তার ভিতর দিয়ে!

সতীশবাবু হতভম্বের মতন বললেন, এ কী কাণ্ড?

হেমন্ত বললে, থার্মিট!

থার্মিট? ও বাবা, সে আবার কী?

জার্মানির এস্যেন শহরের Goldschmidt নামে এক রসায়নবিদ পণ্ডিত এর আবিষ্কারক। Iron oxide আর metallic aluminium-এর মিশ্রণে এটি প্রস্তুত। তার উপরে যদি magnesium powder জ্বালিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে এমন এক ভয়ানক আগুনের সৃষ্টি হয় যে তার তাপ ওঠে fifty-four hundred degrees Fahrenheit পর্যন্ত! থার্মিট যেটুকু জায়গার উপরে ছড়ানো থাকে, লোহার বা ইস্পাতের কেবল সেইটুকু অংশই গলিয়ে দেয়।

সতীশবাবু বললেন, লোহার সিন্দুকের উপরে যদি এই থার্মিট ব্যবহার করা হয়?

তারও দুর্দশা হবে এই দরজাটার মতো!

বাব্বাঃ! হেমন্তবাবু, এত বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি নিয়ে আপনি চোর হলে কলকাতার আর রক্ষে থাকত না!

এখন গল্প রাখুন মশাই, বনের ভিতর কী হচ্ছে জানি না–আগে বন্দিদের উদ্ধার করুন!

লোহার দরজার তলায় একটা সিঁড়ি। তারপরেই অন্ধকার।

সতীশবাবু কোমল-স্বরে ডাকলেন, নীচে কে আছ খোকাবাবুরা! বেরিয়ে এসো–বেরিয়ে এসো! আর তোমাদের ভয় নেই। আমরা তোমার মা-বাবার কাছ থেকে এসেছি!

সিঁড়ির তলায় অন্ধকারের ভিতর থেকে উঁকি মারতে লাগল, তিনখানি শীর্ণকাতর কচিমুখ–উদ্ভ্রান্ত তাদের চোখের দৃষ্টি!

বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

হেমন্ত বললে, সতীশবাবু, খোকাদের ভার আপনার উপরে আমি গোলমালটা কীসের শুনে আসি! এসো রবীন!

বাইরে গিয়ে দেখলুম, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর ও জমাদার আসছে রিভলভার হাতে আগে-আগে, তারপরেই এখানকার দুশমন চেহারার গুন্ডাগুলো তাদের প্রত্যেকেরই হাতে হাতকড়া এবং সব-পিছনে বন্দুকধারী আটজন মিলিটারি-পুলিশ। গুণে দেখলুম, বন্দিরা সংখ্যায় দশজন।

হেমন্ত আনন্দিতকণ্ঠে বলে উঠল, যাক বন্দুকের শব্দ শুনে আমার দুশ্চিন্তা হয়েছিল। এখন বোঝা যাচ্ছে, বন্দুক ছোঁড়া হয়েছে কেবল এদের ভয় দেখাবার জন্যেই! বুঝেছ রবীন, বিনা রক্তপাতেই কেল্লা ফতে–চমৎকার! আমি বৈষ্ণবের ছেলে, রক্তপাত ভালোবাসি না!

.

চতুর্দশ। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে

কলকাতায় এসেছি। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে শ্যামলপুরের জমিদারপুত্র ও লৌহব্যবসায়ী পতিতপাবন নন্দীর পুত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যথাস্থানে।

সতীশবাবু দুর্জয়গড়ের যুবরাজকে নিয়ে প্রাসাদের সামনে গাড়িতে অপেক্ষা করতে লাগলেন–রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করবার জন্যে হেমন্তের সঙ্গে আমি ঢুকলুম রাজবাড়ির ভিতরে। আজকেই হচ্ছে মাসের চব্বিশ তারিখ।

হেমন্ত কার্ড পাঠিয়ে দিলে। পাঁচমিনিট যেতে না যেতেই ভৃত্য এসে আমাদের মহারাজাবাহাদুরের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল।

একখানা কৌচের উপরে মহারাজাবাহাদুর চার-পাঁচটা কুশনে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছেন তাঁর চোখের কোলে গাঢ় কালির রেখা, মুখ যেন বিষণ্ণতার ছবি। কৌচের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মি. গাঙ্গুলি।

আমাদের দেখে মহারাজা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। তারপর বিরক্ত-মুখে বললেন, হেমন্তবাবু, আপনি কি আজ মজা দেখতে এসেছেন?

হেমন্ত বললে, সে কী মহারাজ, আপনার দুঃখ-শোক কি আমার পক্ষে কৌতুককর হতে পারে?

তা ছাড়া আর কি বলব বলুন? শুনলুম আপনি আমার মামলা ছেড়ে দিয়ে গেছেন হাওয়া খেতে।

একথা কে আপনাকে বললে?

গাঙ্গুলি।

মি. গাঙ্গুলি!

গাঙ্গুলি বললেন, চোরকে পনেরো লাখ টাকা দিয়ে আপনি যুবরাজকে ছাড়িয়ে আনতে বলেছিলেন, আমি কেবল সেই কথাই মহারাজাবাহাদুরকে জানিয়েছিলুম।

মহারাজা বললেন, ওকথা বলা আর মামলা ছেড়ে দেওয়া একই কথা!

নিশ্চয়ই নয়।

দীপ্তচক্ষে মহারাজা বললেন, আমার সামনে অত বেশি চেঁচিয়ে জোর-জোর কথা বলবেন না হেমন্তবাবু! আমার পদমর্যাদা ভুলে যাবেন না।

পদমর্যাদা? পদ-সেবা জীবনে কখনও করিনি, কাজেই কারুর পদের মর্যাদা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি কখনও। হেমন্ত হাসতে হাসতে বললে, অত্যন্ত সহজভাবে।

এরকম স্পষ্ট কথা শুনতে বোধ হয় মহারাজাবাহাদুর অভ্যস্ত নন, তিনি বিপুল বিস্ময়ে হেমন্তের মুখের পানে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন।

গাঙ্গুলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন, হেমন্তবাবু, ওসব বাজে কথা যেতে দিন মহারাজাবাহাদুরের মেজাজ আজ ভালো নয়। ভুলে যাবেন না, আজ হচ্ছে মাসের চব্বিশ তারিখ।

হেমন্ত বললে, আমি কিছুই ভুলিনি মি. গাঙ্গুলি! আজ মাসের চব্বিশ তারিখ বলেই আমি এখানে এসেছি।

মহারাজা ভুরু কুঁচকে বললেন, হ্যাঁ, মজা দেখতে। আমার যাবে পনেরো লক্ষ টাকা জলে, আর আপনি দেখবেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা!

আমি মজা দেখতে আসিনি মহারাজা, মজা দেখাতে এসেছি।

একথার অর্থ?

অর্থ হচ্ছে প্রথমত, আপনার পনেরো লক্ষ টাকা জলে পড়বে না, স্থলেই থাকবে– অর্থাৎ ব্যাঙ্কে।

অর্থটা আরও জটিল হয়ে উঠল। নয় কি গাঙ্গুলি?

গাঙ্গুলি বললেন, আমি তো অর্থই খুঁজে পাচ্ছি না। এ হচ্ছে অর্থহীন কথা।

হেমন্ত হেসে বললে, আচ্ছা, সতীশবাবু এসেই এর অর্থ বুঝিয়ে দেবেন। তিনি গাড়িতে বসে আছেন-ডেকে পাঠান।

মহারাজা বললেন, যাও তো গাঙ্গুলি, সতীশবাবুকে এখানে নিয়ে এসো।

গাঙ্গুলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হেমন্ত বললে, মহারাজা, প্রথমে আমি ভেবেছিলুম, কলকাতায় নিজস্ব কোনও ছেলেধরার দল যুবরাজকে চুরি করেছিল। কারণ আপনারা কলকাতায় আসবার আগেই চুরি গিয়েছিল আরও দুটি ছেলে। কিন্তু তারপরেই আমার ভ্রম বুঝেছি। এখন জানতে পেরেছি যে, প্রধানত পুলিশের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করবার জন্যেই প্রথম ছেলে দুটি চুরি করা হয়েছিল। কিন্তু চোরের আসল। উদ্দেশ্য ছিল দুর্জয়গড়ের যুবরাজকেই চুরি করা।

মহারাজা ফ্যালফ্যাল করে হেমন্তের মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, আপনার কোনও কথারই মানে আজ বোঝা যাচ্ছে না!

ঠিক এইসময়ে ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল, সতীশবাবুর সঙ্গে দুর্জয়গড়ের যুবরাজ।

মহারাজা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। স্তম্ভিত চক্ষে!

বাবা, বাবা! বলে চেঁচিয়ে উঠে যুবরাজ ছুটে গিয়ে পিতার কোলের ভিতরে আঁপিয়ে পড়ল।

ছেলেকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মহারাজা খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতন রইলেন-তাঁর দুই চোখ ছাপিয়ে ঝরতে লাগল আনন্দের অশ্রু!

তারপর আত্মসংবরণ করে দুই হাতে ছেলের মুখ ধরে তিনি বললেন, খোকন, খোকন, এতদিন তুই কোথায় ছিলি বাছা?

আমাকে ধরে রেখেছিল বাবা!

কে?

তাদের চিনি না তো!

কে তোকে ফিরিয়ে এনেছে?

যুবরাজ ফিরে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিলে।

মহারাজা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আঁঃ, আপনারা? আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন, আপনারা? আপনাদের এখনি আমি পুরস্কার দেব কল্পনাতীত পুরস্কার! আমার চেক-বুক কই? গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলি!

সতীশবাবু বললেন, মি. গাঙ্গুলি তো এখন আসতে পারবেন না, মহারাজ! তিনি একটু বিপদে পড়েছেন।

বিপদ? গাঙ্গুলি আবার কি বিপদে পড়ল?

তিনি বাইরে গিয়ে যেই দেখলেন গাড়ির ভেতরে আমার পাশে বসে আছেন যুবরাজ, অমনি হরিণের মতো ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনই আমার পাহারাওয়ালারা গিয়ে তাকে ধরে ফেললে। এতক্ষণে হাতে তিনি লোহার বালা পরেছেন।

মহারাজ ধপাস করে কৌচের উপরে বসে পড়ে বললেন, আবার সব মানে গুলিয়ে যাচ্ছে–সব মানে গুলিয়ে যাচ্ছে!

হেমন্ত বললে, কিছু গুলোবে না মহারাজ! সব আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি।..মামলাটা হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দৈবগতিকে একটা সাঙ্কেতিক শব্দে লেখা বিজ্ঞাপন দেখে আবিষ্কার করে ফেলেছিলুম যে, কলকাতায় কেউ আমেরিকান অপরাধীদের অনুকরণে

ছেলে ধরবার জন্যে গুন্ডার দল গঠন করেছে। সে দলপতি হলেও গুন্ডাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মেলামেশা করে না– অনেক কাজই চালায় সাঙ্কেতিক লিপির দ্বারা। সে যে যুবরাজকে কোনও দ্বীপে লুকিয়ে রেখেছে, এও টের পেলুম। তার নিজের হাতে লেখা এক পত্র পেয়ে আরও আন্দাজ করলুম, সে আমেরিকা-ফেরত, কারণ যে চিঠির কাগজ সে ব্যবহার করেছে তা কালিফোর্নিয়ার তৈরি, কলকাতায় পাওয়া যায় না। তারপর রাজবাড়িতে এসে খোঁজ নিয়ে যখন জানলাম যে, আপনার সঙ্গে গাঙ্গুলিও আমেরিকায় গিয়েছিল, তখন প্রথম আমার সন্দেহ আকৃষ্ট হয় তার দিকেই। তারপর একদিন গাঙ্গুলি নিজেই তার মৃত্যুবাণ তুলে দিলে আমার হাতে কোনও খেয়ালে জানি না, মহারাজের কাছ থেকে পুরস্কার-ঘোষণার বিজ্ঞাপন লেখবার ভার পেয়ে সে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করলে। রবীনের মুখে ভাষা শুনে সে নিজের হাতে লিখে নিলে। আর তার সেই হাতের লেখা হল আমার হস্তগত। সাঙ্কেতিক লিপির লেখার সঙ্গে তার হাতের লেখা মিলিয়েই আমার কোনও সন্দেহই রইল না।

মহারাজা অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে বললেন, সব রহস্য জেনেও আপনি তখনি ওই মহাপাপীর সাধুর মুখোশ খুলে দেননি!

দিইনি তার কারণ আছে মহারাজ! অসময়ে গাঙ্গুলিকে গ্রেপ্তার না করবার তিনটে কারণ হচ্ছে : ওইটুকু প্রমাণ আমার পক্ষে যথেষ্ট হলেও আদালতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। গুন্ডার দল তখনও ধরা পড়েনি। দলপতির গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পেলে গুন্ডারা হয়তো প্রমাণ নষ্ট করবার জন্যে যুবরাজকে হত্যা করতেও পারত।

ঠিক, ঠিক! হেমন্তবাবু, আপনার কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। আপনি কি পুরস্কার চান বলুন।

পুরস্কার? আমি পুরস্কারের লোভে কোনও মামলা হাতে নিই না। ভগবানের দয়ায় আমার কোনও অভাব নেই। আমি কাজ করি কাজের আনন্দেই।

না, না, পুরস্কার আপনাকে নিতেই হবে।

www.bengaliebook.com

নিতেই হবে? বেশ, ও-বিষয় নিয়ে আপনি সতীশবাবুর সঙ্গে কথা কইতে পারেন!..ওঠো হে রবীন! মহারাজকে প্রণাম করে আমি এখন সবেগে পলায়ন করতে চাই!